কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীঈশোপনিষদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীঈশোপনিষদ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ

ইংরেজী **Sri Isopanisad**-এর বাংলা অনুবাদ।

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, রোম

Isoponisad (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯১—২০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৩—৩০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৪—৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

E-mail: shyamrup@vsnl.net
Web: www.krishna.com

সূচীপত্র

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১-১০/১ স্কন্ধ)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (চার খণ্ডে)
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (তিন খণ্ডে)
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তিদেবীর শিক্ষা
গীতার রহস্য
জীবন আসে জীবন থেকে
উপদেশামৃত
শ্রীঈশোপনিষদ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
অমৃতের সন্ধানে
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
গীতার গান
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
বৈদিক সাম্যবাদ
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১ঈ,
দোতলা, ১০ গুরুসদয় রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলকাতায়। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং পত্রিকাটির পাণ্ডুলিপি টাইপ করা, প্রুফ সংশোধন করা এবং সম্পাদনার কাজ তিনি স্বহস্তে করেন। এমনকি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি একবার শুরু হওয়ার পর আর বন্ধ হয়ে যায়নি, পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ

সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে তিনি ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে অতি দীনহীনভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর গভীর অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—আঠার হাজার শ্লোক সমন্বিত *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ ও ভাষ্যের কাজ শুরু করেন। *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটিও তিনি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হচ্ছে বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট। শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকা ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করার উদ্দেশে বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।
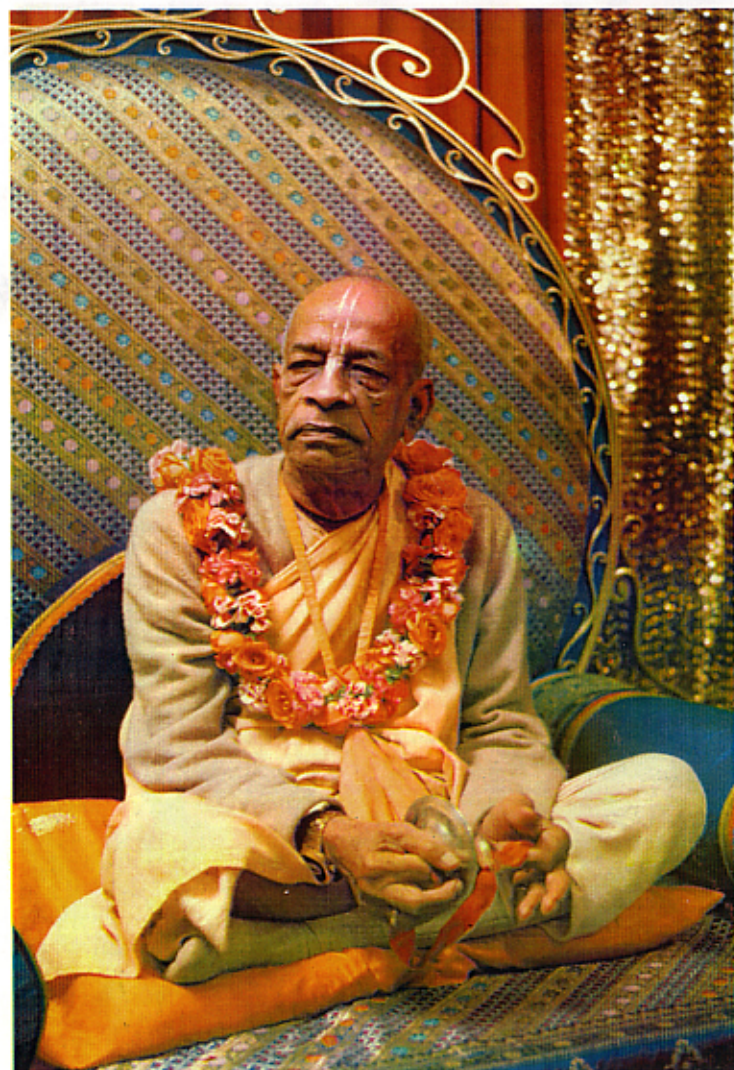
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর শরীরের রোমকূপ থেকে
বীজ আকারে ছোট-বড় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে।
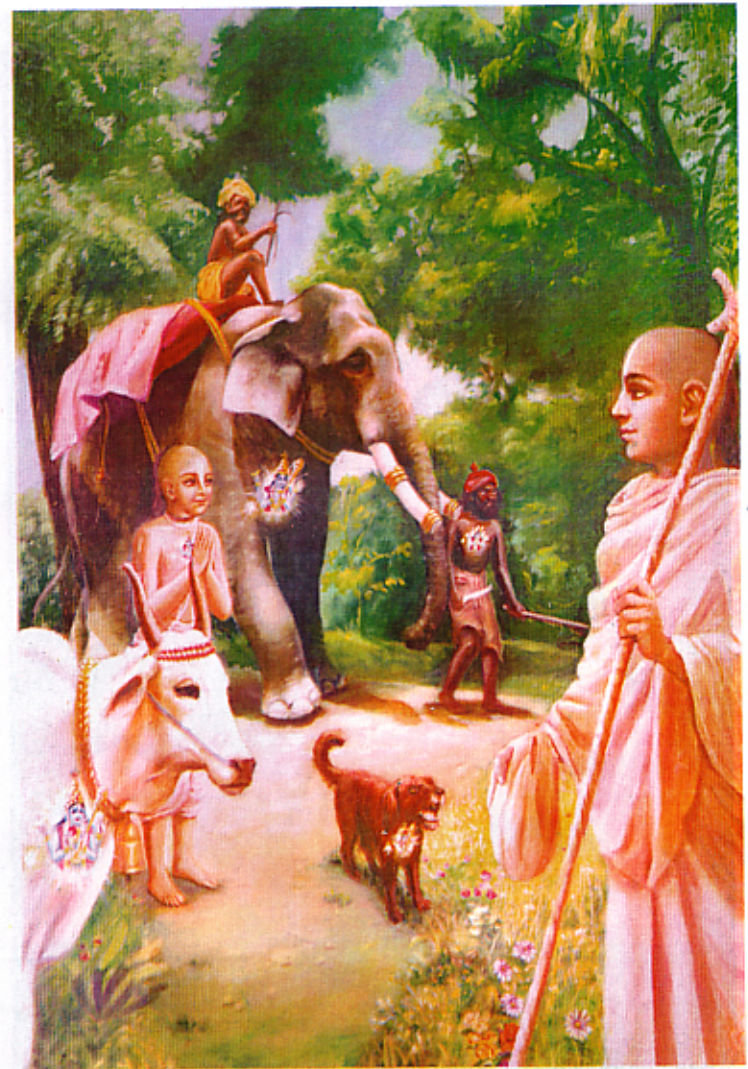
পণ্ডিত ব্যক্তি সকলের প্রতি সমদর্শী কেন না তিনি একই পরমাত্মাকে
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তি, কুকুরাদি সকলের মধ্যেই দর্শন করেন।

সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী সর্বক্ষণ তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মারূপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে দর্শন করেন।

ভক্তিপূর্বক ফল-ফুল নিবেদন করলে, ভগবান তা প্রীতি সহকারে গ্রহণ করেন এবং কৃপাশীর্বাদ দান করেন।

দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি অবতার এবং সমস্ত বিভূতির আদি কারণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে নিত্য লীলাবিলাস করেন।

ইসকন, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে মাধুর্য-মণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধা-মাধব শ্রীবিগ্রহ।

ভূমিকা

বেদের শিক্ষা

[১৯৬৯ সালের ৬ই অক্টোবর লণ্ডনের কনওয়ে হলে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ]

মাননীয় ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বেদের শিক্ষা। বেদ কী? বেদ শব্দটির মৌলিক অর্থ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু তার চরম উদ্দেশ্য এক। বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। যে জ্ঞানই আমরা গ্রহণ করি না কেন তাই হচ্ছে বেদ, কেন না বেদের বিষয় বস্তু হচ্ছে আদিজ্ঞান। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, বদ্ধ জীব চারটি ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত। তার প্রথম হচ্ছে ভ্রম, সে ভুল করতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীকে একজন মহাপুরুষ বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তিনি বহু ভুল করেছেন। তাঁর জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁর সহকারী তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "গান্ধীজী, নতুন দিল্লীর সভাতে যাবেন না। আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, সেখানে গেলে বিপদ হতে পারে।" কিন্তু তিনি তাঁর কথা শোনেননি। তিনি জোর করে সেখানে গিয়েছিলেন এবং নিহত হয়েছিলেন। এমন কি মহাত্মা গান্ধী, প্রেসিডেন্ট কেনেডির মতো কত বড় বড় মানুষ ভুল করে। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সেটি বদ্ধ জীবের একটি ত্রুটি।

আর একটি ত্রুটি হচ্ছে প্রমাদ। প্রমাদ কথাটির অর্থ হচ্ছে মোহগ্রস্ত হওয়া এবং অবাস্তবকে বাস্তব বলে মনে করা—মায়া। মায়া মানে

যা বাস্তব নয়। সকলেই তাদের দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করছে। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কে, তখন আপনি উত্তর দেবেন, "আমি মিঃ জন; আমি খুব ধনী; আমি এই, আমি সেই।" এই সবগুলি হচ্ছে দেহজাত পরিচিতি। কিন্তু আপনি এই দেহটি নন। সেটিই হচ্ছে মোহ বা প্রমাদ।

তৃতীয় ত্রুটি হচ্ছে প্রতারণা করার প্রবৃত্তি। সকলেরই অপরকে প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে। যে লোকটি এক নম্বরের মূর্খ, সে ভান করছে যেন সে কত বড় পণ্ডিত। যদিও তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, সে মোহগ্রস্ত এবং ভুল করে, তবুও সে কল্পনা করে—"আমার মনে হয় এটি এই রকম, ওটা সেই রকম।" কিন্তু সে তার নিজের অবস্থাই জানে না, অথচ সে দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে। সেটিই হচ্ছে তার রোগ। এটি প্রবঞ্চনা।

সর্বশেষে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা। আমাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য আমরা কত গর্বিত। প্রায়ই, আমাদের চ্যালেঞ্জ করে কেউ কেউ বলে, "আপনি কি আমাকে ভগবান দেখাতে পারেন?" কিন্তু ভগবানকে দেখার চোখ কি আপনার রয়েছে? আপনার যদি চোখ না থাকে তবে কখনই দেখতে পারেন না। এখনই যদি এই ঘরটি অন্ধকার হয়ে যায়, তা হলে আপনার হাতগুলিও আপনি দেখতে পারেন না। সুতরাং দেখার কী ক্ষমতা আপনাদের মধ্যে রয়েছে? তাই আমরা এই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা *বেদ* বা জ্ঞান লাভ করার আশা করতে পারি না। বদ্ধ জীবনে এই সমস্ত অক্ষমতাবশত আমরা কাউকে পূর্ণজ্ঞান দান করতে পারি না। আমরা নিজেরা ত্রুটিহীন নই। তাই আমরা *বেদকে* যথাযথভাবে গ্রহণ করি।

আপনারা বলতে পারেন যে, *বেদ* হচ্ছে হিন্দুদের গ্রন্থ। কিন্তু হিন্দু নামটি বিদেশীদের দেওয়া। আমরা হিন্দু নই। আমাদের যথার্থ পরিচিতি হচ্ছে, আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করি। *বর্ণাশ্রম* কথাটি

বেদের অনুসরণকারীদের নির্দেশ করে যারা মানব-সমাজকে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের অন্তর্গত বলে স্বীকার করে। সমাজের চারটি বিভাগ রয়েছে এবং পারমার্থিক জীবনের চারটি বিভাগ রয়েছে। তাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, "এই বিভাগগুলি সর্বত্রই রয়েছে, কারণ সেগুলি ভগবান নিজেই সৃষ্টি করেছেন।" সমাজের বিভাগগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন। তেমনই, ক্ষত্রিয় বা পরিচালক গোষ্ঠী হচ্ছে পরবর্তী বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ। তারপর হচ্ছেন বৈশ্য বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এই স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এটিই হচ্ছে বৈদিক নীতি এবং আমরা তা স্বীকার করি। বৈদিক তথ্যগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করা হয়, কেন না তাতে কোনরকম ভুল নেই। সেটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার পন্থা। যেমন, ভারতবর্ষে গোময়কে পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয় এবং যদিও গোময় হচ্ছে পশুর বিষ্ঠা। *বেদে* এক জায়গায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিষ্ঠা বা মল হচ্ছে অপবিত্র এবং তা যদি কখনও স্পর্শ হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ স্নান করতে হবে। কিন্তু আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, গরুর মল পবিত্র। গোময় দিয়ে অপবিত্র স্থানকে লেপন করলে সেই স্থান পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই দুটি নির্দেশ পরস্পর-বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু এটি মিথ্যা নয় এটি সত্য। কলকাতায় একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক গোময় বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, তাতে অদ্ভুত বীজাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে।

ভারতবর্ষে কেউ যখন কাউকে বলে, "তোমাকে এটি করতেই হবে।" তখন অন্য লোকটিকে বলতে শোনা যায়, "তুমি কি বলতে চাও এটি কি বেদবাক্য যে কোন কিছু বিবেচনা না করেই আমাকে

মেনে নিতে হবে?" বৈদিক নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে, সেই নির্দেশগুলি সম্বন্ধে যদি সাবধানতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা হয়, তা হলে দেখা যায় যে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত।

বেদ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নয়। বৈদিক জ্ঞান নেমে এসেছে চিন্ময় জগৎ থেকে—শ্রীকৃষ্ণ থেকে। *বেদের* আর একটি নাম হচ্ছে *শ্রুতি*। *শ্রুতি* সেই জ্ঞানকে নির্দেশ করে যা শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করতে হয়। এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান নয়। *শ্রুতি* শাস্ত্রকে মায়ের মতো বলে মনে করা হয়। আমাদের মায়ের কাছ থেকে আমরা কত জ্ঞান লাভ করি। যেমন, আপনি যদি জানতে চান আপনার পিতা কে? তা হলে সেই প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? মা দিতে পারেন। মা যদি বলেন, "ইনি হচ্ছেন তোমার পিতা", তা হলে আপনাকে সেটি মেনে নিতেই হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনি জানতে পারেন না আপনার পিতা কে। তেমনই, যে বস্তু আপনার অভিজ্ঞতার অতীত, আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জ্ঞানের অতীত, আপনার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের অতীত, সেই সম্বন্ধে যদি আপনি জানতে চান, তা হলে আপনাকে বৈদিক শাস্ত্রের শরণাগত হতেই হবে। সেই সম্বন্ধে গবেষণা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গবেষণা অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান বলে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠিক যেমন, পিতা সম্বন্ধে মায়ের বক্তব্য ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

বেদ হচ্ছে মাতা এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন পিতামহ। ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সৃষ্টির আদিতে প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা। তিনিই প্রথম বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং তারপর তিনি তা নারদ এবং তাঁর অন্যান্য শিষ্য ও পুত্রদের দান করেন। তারপর তাঁরা এই জ্ঞান তাঁদের শিষ্যদের দান করেন। এভাবেই পরম্পরাক্রমে

বৈদিক জ্ঞান নেমে আসে। *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এভাবেই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেও চরমে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়, তাই সময়ের অপচয় না করে সেটি গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ যদি জানতে চায় যে, তার পিতা কে এবং সে যদি তার মাকে নির্ভরযোগ্য সূত্ররূপে গ্রহণ করে, তা হলে মা যা বলেন সেটিকেই বিনা তর্কে স্বীকার করে নিতে হয়। তিন রকমের প্রমাণ রয়েছে—*প্রত্যক্ষ*, *অনুমান* এবং *শব্দ*। *প্রত্যক্ষ* মানে সরাসরিভাবে। সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রমাণ তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রান্ত। আমরা প্রতিদিন সূর্যকে দেখি এবং তা দেখতে ঠিক একটা থালার মতো মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি বহু গ্রহ-নক্ষত্রগুলির থেকে অনেক বড়। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিশক্তির কি মূল্য? তাই আমাদের বই পড়তে হয়; তখন আমরা সূর্য সম্বন্ধে জানতে পারি। সুতরাং, সরাসরিভাবে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণ নয়। তারপর *অনুমান*— "এটি এই রকম হতে পারে," এভাবেই কল্পনা করা। যেমন, ডারউইন মতবাদ বলেছে যে, এটি এই রকম হতে পারে, এটি ওই রকম হতে পারে, কিন্তু সেটি বিজ্ঞান নয়। সেটি একটি ধারণা এবং এটিও অভ্রান্ত নয়। কিন্তু আপনি যদি প্রামাণিক সূত্র থেকে জ্ঞান লাভ করেন, তা হলে সেই জ্ঞান হচ্ছে পূর্ণ। আপনি যদি রেডিও স্টেশন কর্তৃপক্ষ থেকে রেডিওর কর্মসূচী পান, তখন আপনি নিঃসন্দেহে তা গ্রহণ করেন। আপনি তা অস্বীকার করেন না; যেহেতু সেটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া গেছে, তাই সেই সম্বন্ধে আপনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় না।

বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শব্দ-প্রমাণ*। তার আর একটি নাম হচ্ছে *শ্রুতি*। *শ্রুতি* মানে এই জ্ঞান কেবল শ্রবণ করার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অপ্রাকৃত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে

হলে, আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী আচার্যের কাছ থেকে তা শ্রবণ করতে হবে। অপ্রাকৃত জ্ঞান হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে জড়-জাগতিক জ্ঞান এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত হচ্ছে অপ্রাকৃত জ্ঞান। আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমাতেই যেতে পারি না, তা হলে আমরা অপ্রাকৃত জগতে যাব কী করে? তাই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

চিন্ময় জগৎ রয়েছে। এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত আর একটি প্রকৃতি রয়েছে। কিন্তু আমরা কিভাবে জানব যে আর একটি জগৎ রয়েছে, যেখানকার গ্রহগুলি এবং সেখানকার অধিবাসীরা নিত্য? এই সব জ্ঞান সেখানে রয়েছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব কী করে? সেটি সম্ভব নয়। তাই *বেদের* শরণাগত হতে হয়। তাকে বলা হয় বৈদিক জ্ঞান। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা জ্ঞান লাভ করি সব চাইতে নির্ভরযোগ্য সূত্র শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে। সর্বশ্রেণীর মানুষই শ্রীকৃষ্ণকে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে মনে করেন। আমি সর্বপ্রথমে দুই শ্রেণীর পরমার্থবাদীদের কথা বলছি। একটি শ্রেণীর পরমার্থবাদীদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী। সাধারণত তাদের শঙ্করাচার্যের অনুগামী বৈদান্তিক বলা হয়। আর অপর শ্রেণীর পরমার্থবাদীদের বলা হয় বৈষ্ণব, যেমন রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ইত্যাদি। শঙ্কর সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মেনে নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করাচার্য ছিলেন নির্বিশেষবাদী, যিনি নির্বিশেষবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রচার করে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন সবিশেষবাদী। *ভগবদ্গীতায়* তাঁর ভাষ্যে তিনি লিখেছেন—"পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ মহাজাগতিক প্রকাশের অতীত।" এবং তারপর পুনরায় তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন, "সেই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি দেবকী

এবং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" তিনি বিশেষভাবে তাঁর পিতা এবং মাতার নাম উল্লেখ করেছেন। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে গেছেন। এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান আমরা লাভ করি প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে। আমাদের প্রকাশিত *ভগবদ্গীতার* নাম হচ্ছে *'ভগবদ্গীতা যথাযথ'* কারণ কোন রকম কদর্থ না করে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে *ভগবদ্গীতা* শুনিয়ে গেছেন, ঠিক সেভাবেই আমরা তাঁকে গ্রহণ করি সেটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান। যেহেতু বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে পবিত্র, তাই আমরা তা স্বীকার করি। কৃষ্ণ যা বলেছেন, আমরা তা-ই স্বীকার করি। তাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনার অমৃত। তার ফলে সময়ের অপচয় হয় না। আপনি যদি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জ্ঞান লাভ করেন, তা হলে আপনার সময় নষ্ট হয় না। যেমন, এই জড় জগতে জ্ঞান লাভের দুটি পন্থা রয়েছে—আরোহ এবং অবরোহ। অবরোহ পন্থায় আমরা স্বীকার করি যে, মানুষ মরণশীল। আপনার পিতা বলেছেন যে, মানুষ মরণশীল, আপনার বোন বলেছে মানুষ মরণশীল। এভাবেই সকলেই বলে যে মানুষ মরণশীল—কিন্তু সেটা নিয়ে আপনি কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না। মানুষ যে মরণশীল তা যথার্থ সত্য বলে আপনি মেনে নেন। মানুষ মরণশীল কি না তা যদি আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে চান, তা হলে প্রতিটি মানুষকে আপনার পরীক্ষা করতে হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের মনে হতে পারে যে, এমন কোন মানুষ থাকতে পারে যে মরণশীল নয়, কিন্তু তাকে আপনি এখনও দেখেননি। সুতরাং এভাবেই আপনার গবেষণার কখনই শেষ হবে না। সংস্কৃত ভাষায় এই পন্থাটিকে বলা হয় *আরোহ* পন্থা। আপনার অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলি প্রয়োগ করে, নিজের প্রচেষ্টায় যদি আপনি জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করেন তা হলে আপনি কোনদিনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। সেটি কখনই সম্ভব নয়।

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে—মনের গতিতে ভ্রমণশীল বিমানে আরোহণ করুন। এই জড় জগতে মানুষের তৈরি বিমানগুলি বড় জোর ঘণ্টায় দুই হাজার বেগে চলতে পারে, কিন্তু মনের গতিবেগ কত? আপনি ঘরে বসে আছেন, কিন্তু আপনি যদি এখনই ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন, যা হচ্ছে প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে, তা হলে নিমেষের মধ্যে আপনি সেখানে চলে যেতে পারেন। আপনার মন সেখানে চলে যায়। সুতরাং মনের গতি কত দ্রুত। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, "সেই মনের গতিতে যদি লক্ষ লক্ষ বছর ধরেও ভ্রমণ করা যায়, তবুও আমরা সেই চিদাকাশে পৌঁছতে পারব না। এমন কি চিৎ-জগতের সীমানায় পর্যন্ত যেতে পারব না।" তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, মানুষকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। আর সদ্‌গুরুর যোগ্যতা কী? তিনি যথার্থ সূত্র থেকে বৈদিক জ্ঞান সঠিকভাবে শ্রবণ করেছেন। তা যদি না হয়, তা হলে তিনি সদ্‌গুরু নন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ব্রহ্মে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত। এই দুটি হচ্ছে তাঁর যোগ্যতা। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে বৈদিক তত্ত্বদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "বৈদিক অনুসন্ধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা।" *ব্রহ্মসংহিতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণের, গোবিন্দের অনন্ত রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সকলে এক।" সেই রূপগুলি আমাদের রূপের মতো নশ্বর নয়। তাঁর রূপ অবিনশ্বর—অচ্যুত। আমার রূপের আদি রয়েছে, কিন্তু তাঁর রূপ অনাদি অনন্ত। এবং তাঁর রূপ যদিও অসংখ্য, তবুও তাঁদের কোনও অন্ত নেই। আমার এই শরীরটি এখানে বসে আছে, কিন্তু এখন আমি আমার ঘরে নেই। আপনি ওখানে বসে আছেন এবং তাই এখন আপনি আপনার ঘরে উপস্থিত নন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একই সময় সর্বত্র বিরাজ করতে পারেন। তিনি গোলোক বৃন্দাবনে থাকতে পারেন,

আবার সেই সঙ্গে তিনি সর্বত্রই সর্বব্যাপ্ত। তিনি আদিপুরুষ, তিনি সব চাইতে প্রাচীন পুরুষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর রূপ পনের-ষোল বছর বয়সের একটি যুবকের মতো। আমরা কখনও তাঁকে বৃদ্ধরূপে দেখি না। আপনারা *ভগবদ্‌গীতায়* রথের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখেছেন। তখন তাঁর বয়স একশ বছর থেকে কম ছিল না। তাঁর প্রপৌত্র ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখতে তখনও ঠিক একটি বালকের মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃদ্ধ হন না। সেটিই হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। আর আপনি যদি বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে চান, তা হলে আপনি ব্যর্থ হবেন। সেটি সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। কিন্তু আপনারা তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারেন তাঁর ভক্তের কাছ থেকে। তাঁর ভক্ত তাঁকে দিতে পারেন— "এখানে তিনি আছেন, তাঁকে গ্রহণ কর।" সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের শক্তি।

আদিতে কেবল একটি মাত্র *বেদ* ছিল, এবং তা পাঠ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তখনকার মানুষ এত মেধাবী ছিল এবং তাদের স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে একবার শোনা মাত্রই তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তারা তৎক্ষণাৎ তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু আজ থেকে ৫,০০০ বছর আগে এই কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য ব্যাসদেব *বেদ* লিপিবদ্ধ করেন। তিনি জানতেন যে, ধীরে ধীরে এই যুগের মানুষের আয়ু অত্যন্ত কমে যাবে, তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাবে এবং তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি বেদ লিপিবদ্ধ করেন যাতে কলিযুগের বুদ্ধিহীন, মেধাহীন মানুষেরা অন্তত সেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। তিনি *বেদকে* চারটি ভাগে বিভক্ত করেন—*ঋক্‌*, *সাম*, *অথর্ব* এবং *যজুঃ*। তারপর তিনি তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের ওপর এই সমস্ত *বেদের* ভার ন্যস্ত করেন। তারপর তিনি অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন স্ত্রী,

শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের কথা চিন্তা করেন। *দ্বিজবন্ধু* মানে হচ্ছে যারা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করেনি। যে মানুষ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ নয়, তাকে বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই সমস্ত মানুষদের জন্য তিনি ভারতের ইতিহাস *মহাভারত* রচনা করেন এবং অষ্টাদশ *পুরাণ* রচনা করেন। এই সবই বৈদিক শাস্ত্র—*পুরাণ, মহাভারত, চতুর্বেদ* এবং *উপনিষদ*। *উপনিষদগুলি* হচ্ছে *বেদের* অঙ্গ। তারপর ব্যাসদেব পণ্ডিত এবং দার্শনিকদের জন্য সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম *বেদান্তসূত্র* লিপিবদ্ধ করেন। এটিই হচ্ছে *বেদের* শেষ কথা। ব্যাসদেব তাঁর গুরুমহারাজ নারদমুনির নির্দেশ অনুসারে *বেদান্তসূত্র* রচনা করেন, কিন্তু তবুও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে অনেক কথা, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *অনেকগুলি পুরাণ, উপনিষদ,* এমন কি *বেদান্তসূত্র* রচনা করার পরেও ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তারপর তাঁর গুরুদেব নারদমুনি তাঁকে নির্দেশ দেন, "তুমি *বেদান্ত* বিশ্লেষণ কর।" *বেদান্ত* মানে অন্তিম জ্ঞান এবং সেই চরম জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত *বেদের* মধ্যে একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছেন তিনি। *বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্*। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমিই হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা এবং আমিই হচ্ছি বেদবেত্তা।" তাই চরম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেটি *বেদান্ত* দর্শনের সমস্ত বৈষ্ণব ভাষ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা হচ্ছি গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আমাদেরও *বেদান্ত* দর্শনের ভাষ্য রয়েছে এবং তা হচ্ছে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত *গোবিন্দ-ভাষ্য*। তেমনই, রামানুজাচার্যের ভাষ্য রয়েছে এবং মধ্বাচার্যের ভাষ্য রয়েছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই একমাত্র ভাষ্য নয়। বহু *বেদান্তভাষ্য* রয়েছে, কিন্তু যেহেতু বৈষ্ণবেরা প্রথম *বেদান্তভাষ্য* উপস্থাপন করেননি, তাই সাধারণ মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ভাষ্যই হচ্ছে একমাত্র ভাষ্য। তা ছাড়া, ব্যাসদেব নিজে পূর্ণ

বেদান্তভাষ্য—*শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* শুরু হচ্ছে বেদান্তসূত্রের প্রথম কথা দিয়ে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। আর সেই *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকটির পূর্ণ বিশ্লেষণ হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতে*। *বেদান্তসূত্রে* পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেবল আভাস দেওয়া হয়েছে— "পরমতত্ত্ব হচ্ছে সেই বস্তু যা থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে।" এটি কেবল সারমর্ম, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব কিছুই যদি পরমতত্ত্ব থেকে প্রকাশিত হয়, তা হলে সেই পরমতত্ত্বের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কী রকম? সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই পরমতত্ত্ব অবশ্যই চেতন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ (*স্বরাট্*)। আমরা অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আমাদের চেতনা এবং জ্ঞান বিকাশ সাধন করি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং জ্ঞানময়। সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে *বেদান্তসূত্র* এবং তার রচয়িতা স্বয়ং সেই *বেদান্তসূত্রের* বিশ্লেষণ করেছেন *শ্রীমদ্ভাগবতে*। যাঁরা যথার্থভাবে বৈদিক জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁদের আমরা অনুরোধ করব, তাঁরা যেন *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* থেকে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন।

আবাহন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ—শব্দব্রহ্ম; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; অদঃ—তা; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; ইদম্—এই প্রপঞ্চময় জগৎ; পূর্ণাৎ—পরম পূর্ণ থেকে; পূর্ণম্—পূর্ণ; উদচ্যতে—উদ্ভূত হয়; পূর্ণস্য—পরম পূর্ণের; পূর্ণম্—পূর্ণরূপে; আদায়—গ্রহণ করা হলে; পূর্ণম্—কেবল পূর্ণই; এব—এমন কি; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে, এই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরম পূর্ণ থেকে যা কিছু উদ্ভূত হয়েছে, তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

তাৎপর্য

পরম পূর্ণ বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপলব্ধি হচ্ছে পরম পূর্ণের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের *সৎ* অর্থাৎ তাঁর নিত্যত্বের উপলব্ধি, আর পরমাত্মার উপলব্ধি হচ্ছে তাঁর *সৎ* ও *চিৎ* উপলব্ধি, অর্থাৎ তাঁর নিত্যত্ব ও জ্ঞানময় স্বরূপের উপলব্ধি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি হচ্ছে *সৎ, চিৎ* ও *আনন্দময়*—সমস্ত অপ্রাকৃত রূপের উপলব্ধি। যখন কেউ

পরম পুরুষকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি পূর্ণ বিগ্রহরূপে এই সমস্ত রূপ উপলব্ধি করেন। সুতরাং পরম পূর্ণ নিরাকার নন। তিনি যদি নিরাকার হতেন অথবা তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূন হতেন, তা হলে তিনি পূর্ণ হতে পারতেন না। পরম পূর্ণের মধ্যে অবশ্যই সব কিছু থাকবে, তা আমাদের জ্ঞাতই হোক বা অজ্ঞাতই হোক। অন্যথায় তিনি পূর্ণ হতে পারেন না।

পরম পূর্ণ, পরমেশ্বর ভগবান অসীম শক্তির অধিকারী। এই সমস্ত শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের মতোই পূর্ণ। তাই এই দৃশ্যমান অথবা প্রাকৃত জগৎও স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ। যে চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা এই অনিত্য জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সংরক্ষণের জন্য অন্য কোন পৃথক শক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এই ব্রহ্মাণ্ড নিজস্ব কাল পরিমাণে কাজ করছে, যা পরম পূর্ণের শক্তিতে সুনির্ধারিত রয়েছে। যখন সেই নির্ধারিত কাল-পরিমাণ সম্পূর্ণ হয়, তখন এই অনিত্য প্রকাশ পূর্ণতত্ত্বের পরিপূর্ণ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পূর্ণকে উপলব্ধি করার জন্য পূর্ণ এককদের অর্থাৎ জীবাত্মাদের সব রকম সুযোগ দেওয়া হয়। পূর্ণ সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানের ফলেই সব রকম অসম্পূর্ণতার বোধ হয়। জীবনের চেতনার পূর্ণ প্রকাশ হয় মনুষ্যরূপে এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ৮৪ লক্ষ প্রজাতির মধ্য দিয়ে আবর্তিত হওয়ার পর মানবদেহ লাভ হয়। জীব যদি পূর্ণ চেতনার আশীর্বাদ-স্বরূপ এই মানব-জীবনে পরম পূর্ণের মধ্যে তার নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে না পারে, তা হলে সে পরম পূর্ণকে উপলব্ধি করার সুযোগ হারায়। তখন আবার তাকে জড়া প্রকৃতির বিধান অনুসারে আবর্তনশীল জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হতে হয়।

আমাদের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে তা আমরা জানি না বলেই, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তথাকথিত পরিপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য আমরা প্রকৃতির যাবতীয় সম্পদ ব্যবহারের চেষ্টা করি। যেহেতু পরম পূর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে জীব ইন্দ্রিয়-সুখের জীবন উপভোগ করতে পারে না, তাই ইন্দ্রিয়-সুখময় বিপথগামী জীবনকে বলা হয় মায়া। হাত যতক্ষণ পূর্ণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ তা দেহের একটি পূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু হাতটি যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে তাকে হাতের মতো দেখাবে বটে, কিন্তু তাতে হাতের কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। তেমনই, জীব হচ্ছে পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তারা যদি পরম পূর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে পূর্ণতার মায়িক প্রকাশের মাধ্যমে তারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

যখন কেউ পরম পূর্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখনই কেবল সে মানব-জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। জগতের যাবতীয় সেবাকর্ম,—তা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক কিংবা বিশ্বজনীন যাই হোক না কেন—তা সর্বদাই অপূর্ণ থাকবে, যতক্ষণ না পরম পূর্ণের উদ্দেশ্যে তা সাধিত হচ্ছে। যখন সব কিছু পরম পূর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন যুক্ত অংশগুলিও পূর্ণ হয়ে উঠে।

মন্ত্র এক

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥ ১ ॥

ঈশ—ভগবানের দ্বারা; আবাস্যম্—নিয়ন্ত্রিত; ইদম্—এই; সর্বম্—সব কিছু; যৎ কিঞ্চ—যা কিছু; জগত্যাম্—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে; জগৎ—জড় এবং চেতন সব কিছু; তেন—তাঁর দ্বারা; ত্যক্তেন—নির্ধারিত বরাদ্দ; ভুঞ্জীথাঃ—তোমার গ্রহণ করা উচিত; মা—না; গৃধঃ—লাভ করতে চেষ্টা করা; কস্য স্বিদ্—অন্য কারও; ধনম্—ধন।

অনুবাদ

এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সব কিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালভাবে জেনে, কখনই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত, কারণ তা স্বয়ং ভগবান থেকে শুরু করে গুরু-পরম্পরার ধারায় অবিকৃতভাবে নেমে এসেছে। বৈদিক জ্ঞান প্রথমে ভগবান নিজেই দান করেছিলেন এবং তা অপ্রাকৃত উৎস থেকে আহরণ করতে হয়। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণীকে বলা হয় *অপৌরুষেয়*, যা ইঙ্গিত করে যে, এই জড় জগতের কোনও ব্যক্তি তা প্রদান করেননি। এই জড় জগতের জীবদের চারটি ত্রুটি রয়েছে—১) *ভ্রম*, অর্থাৎ ভুল করার প্রবণতা; ২) *প্রমাদ*, অর্থাৎ সে মোহাচ্ছন্ন, ৩)

বিপ্রলিপ্সা, অর্থাৎ অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা এবং ৪) *করণাপাটব,* অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ। এই চারটি ত্রুটি থাকার ফলে বদ্ধ অবস্থায় জীব সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদান করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত বদ্ধ জীবেরা প্রকাশ করেনি। বৈদিক জ্ঞান প্রথমে এই জগতে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান প্রকাশ করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা সেই জ্ঞান তাঁর পুত্র এবং শিষ্যদের প্রদান করেন, এবং তাঁরা পরম্পরাক্রমে সেই জ্ঞান অন্যদের প্রদান করেছেন।

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন *পূর্ণম্,* তাই তিনি কখনও জড় জগতের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না; কিন্তু জীব এবং জড় বস্তু উভয়েই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন এবং চরমে ভগবানের শক্তির অধীন। এই *ঈশোপনিষদ হচ্ছে যজুর্বেদের* একটি অংশ এবং তাতে এই জগতের অস্তিত্বশীল সব কিছুর মালিকানা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে *পরা* এবং *অপরা* প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভগবদ্গীতা* ৭/৪-৫)। মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি ভগবানের অপরা শক্তি বা নিকৃষ্ট শক্তিজাত, কিন্তু জীব বা জৈব শক্তি ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তি। এই দুটি প্রকৃতি বা শক্তিই ভগবানের থেকে উদ্ভূত এবং চরমে তিনিই হচ্ছেন অস্তিত্বশীল সব কিছুর নিয়ন্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই যা পরা অথবা অপরাশক্তি সম্ভূত নয়; তাই সব কিছুই হচ্ছে পরমব্রহ্মের সম্পত্তি।

পরমব্রহ্ম, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সব কিছু সমন্বয় সাধন করার পূর্ণ এবং অভ্রান্ত বুদ্ধিমত্তা তাঁর রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে কখনও কখনও আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং সজীব ও নির্জীব সমস্ত বস্তুকে সেই

আগুনের তাপ এবং আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঠিক যেভাবে আগুন তাপ এবং আলোক শক্তি বিকিরণ করে, তেমনই ভগবানও বিভিন্নভাবে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন। এভাবেই তিনি সব কিছুর পরম নিয়ন্তা, পরম পালক এবং পরম একনায়ক। তিনি সব কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং তিনি সকলেরই পরম সুহৃদ। সব কয়টি অচিন্ত্য শক্তি—ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান।

তাই যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে আমাদের জানতে হবে যে, ভগবান ছাড়া অন্য কেউই কোন কিছুর মালিক নন। ভগবান আমাদের জন্য যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেইটুকু কেবল আমাদের গ্রহণ করা উচিত। যেমন, গরু দুধ দেয়, কিন্তু সেই দুধটি সে খায় না; সে ঘাস আর দানা খায় এবং তার দুধ হচ্ছে মানুষের খাদ্য। এমনই সুন্দরভাবে ভগবান সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের জন্য যা আলাদা করে রেখেছেন, তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং আমাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিত, যে সমস্ত জিনিস আমরা গ্রহণ করছি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি বাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, পাথর, লোহা, সিমেন্ট এবং এই ধরনের সমস্ত জড় পদার্থ দিয়ে, এখন আমরা যদি *ঈশোপনিষদের* পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি, তা হলে আমরা জানতে পারব যে, এর কোনওটিই আমরা তৈরি করতে পারি না। আমরা কেবল আমাদের শ্রম দিয়ে সেগুলি জড়ো করে সেগুলিকে বিভিন্ন রূপ দান করতে পারি। কোনও শ্রমিক তার কঠোর শ্রম দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার জন্য তার মালিকানা দাবি করতে পারে না।

আধুনিক সমাজে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে সর্বদাই ভীষণ সংঘর্ষ হচ্ছে। এই সংঘর্ষ একটি আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে এবং তার ফলে সমস্ত পৃথিবী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে

শত্রুতা হচ্ছে এবং তারা কুকুর- বেড়ালের মতো ঝগড়া করছে। *শ্রীঈশোপনিষদের* জ্ঞান কুকুর-বেড়ালকে উপদেশ দান করার জন্য নয়, তা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে মানুষের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের বাণী প্রদান করছে। মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে *ঈশোপনিষদের* এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা এবং জড় বস্তুর মালিকানা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করা। পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে আমাদের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কমিউনিস্ট, ক্যাপিট্যালিস্ট অথবা অন্য সমস্ত দলগুলি যদি প্রকৃতির সম্পদের উপর মালিকানা দাবি করে, তা হলে মানব-সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়, কেননা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি। ক্যাপিট্যালিস্টরা যেমন রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা কমিউনিস্টদের দমন করতে পারবে না, তেমনই কমিউনিস্টরা তাদের রুটির জন্য লড়াই করে ক্যাপিট্যালিস্টদের পরাস্ত করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরমেশ্বর ভগবানের মালিকানা স্বীকার করছে, ততক্ষণ যে সম্পত্তি তারা তাদের নিজেদের বলে দাবি করছে, তা সবই হচ্ছে চুরি করা সম্পদ। সেই অপরাধের জন্য তাদের প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করতে হবে। পারমাণবিক বোমাগুলি কমিউনিস্ট আর ক্যাপিট্যালিস্ট উভয়ের হাতেই রয়েছে এবং তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব স্বীকার না করে, তা হলে অন্তিমে সেই বোমাগুলি এই উভয় গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করবে। তাই তাদের রক্ষা করার জন্য এবং জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উভয় দলেরই কর্তব্য *ঈশোপনিষদের* উপদেশ অনুসরণ করা।

কুকুর-বেড়ালের মতো ঝগড়া করা মানুষের উদ্দেশ্য নয়। যথেষ্ট বুদ্ধি সহকারে তাদের মানব-জীবনের গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া কর্তব্য। বৈদিক শাস্ত্র রচিত হয়েছে মানুষদের জন্য, কুকুর-বেড়ালদের জন্য নয়। কুকুর-বেড়ালেরা অন্য প্রাণী হত্যা করে আহার করতে পারে এবং তার ফলে তাদের কোনও পাপ হয় না,

কিন্তু কোনও মানুষ যখন তার অদম্য রসনা তৃপ্তির জন্য কোন পশুকে হত্যা করে, তখন প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য তাকে সেই পাপের ভাগী হতে হয়। পরিণামে তাকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়।

মানব-জীবনের বিধি-নিয়ম পশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একটি বাঘ চাল, গম খায় না অথবা গরুর দুধ পান করে না, কারণ তার আহার হচ্ছে পশুর মাংস। বহু পশু-পক্ষী রয়েছে যারা হয় মাংসাশী, নয় নিরামিষাশী, কিন্তু তারা কেউই ভগবানের ইচ্ছার অধীন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং অন্যান্য সমস্ত নিম্ন স্তরের প্রাণীরা অবিচলিতভাবে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে; তাই তাদের ক্ষেত্রে কোন রকম পাপের প্রশ্ন ওঠে না, আবার বৈদিক নির্দেশগুলিও তাদের জন্য নয়। কেবল মনুষ্য-জীবনই হচ্ছে দায়িত্ব-সম্পন্ন জীবন।

কেবল নিরামিষাশী হলেই যে প্রকৃতির নিয়মগুলির লঙ্ঘন পরিহার করা হয়, তা মনে করা ভুল। গাছেরও প্রাণ রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, একটি জীব আর একটি জীবের আহার। সুতরাং নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী হওয়ার জন্য গর্ব করা উচিত নয়; আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। ভগবানকে জানার মতো উন্নত বুদ্ধিমত্তা পশুদের নেই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে কার্য করে তা জেনে, এই জ্ঞানের যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করার উপযুক্ত বুদ্ধি মানুষের রয়েছে। মানুষ যদি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অবহেলা করে, তা হলে তার জীবন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, সব কিছু ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করা এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদই কেবল গ্রহণ করা। তার ফলে তিনি তার কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেন। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান সরাসরিভাবে বলেছেন যে, তিনি কেবল শুদ্ধ-ভক্তের প্রদত্ত নিরামিষ আহারই গ্রহণ করেন (*ভগবদ্‌গীতা*

৯/২৬)। তাই মানুষকে কেবল নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী হলেই চলবে না, তাকে ভগবানের ভক্ত হতে হবে এবং তার সমস্ত আহার্য ভগবানকে নিবেদন করতে হবে। তারপর কেবল ভগবানের প্রসাদরূপে অথবা ভগবানের করুণারূপে তা গ্রহণ করতে হবে। যে ভক্ত এভাবেই সচেতন হয়ে আচরণ করেন, তিনিই যথাযথভাবে মানব-জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করছেন। যে সমস্ত মানুষ ভগবানকে নিবেদন না করে আহার করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের পাপ ভক্ষণ করছে এবং পরিণামে এই পাপের ফলস্বরূপ তাদের নানারকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৩)।

সমস্ত পাপের মূল উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব অস্বীকার করে প্রকৃতির নিয়মের অবাধ্যতা করা। প্রকৃতির নিয়মের অবাধ্যতা অথবা ভগবানের আদেশ অমান্য করার ফলে মানুষের সর্বনাশ হয়। কেউ যদি যথার্থভাবে প্রকৃতিস্থ হন, প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত হন এবং অনর্থক আসক্তি অথবা বিরক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হন, তা হলে ভগবান অবশ্যই তাকে কৃপা করেন, এবং তিনি তখন নিঃসন্দেহে তাঁর নিত্য আলয় ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

মন্ত্র দুই

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

কুর্বন্—অবিচ্ছিন্নভাবে করে; **এব**—এভাবেই; **ইহ**—এই জীবনে; **কর্মাণি**—কর্ম; **জিজীবিষেৎ**—জীবিত থাকার বাসনা করা উচিত; **শতম্**—একশ; **সমাঃ**—বছর; **এবম্**—এভাবেই; **ত্বয়ি**—তোমাকে; **ন**—না; **অন্যথা**—বিকল্প; **ইতঃ**—এই পথ থেকে; **অস্তি**—আছে; **ন**—না; **কর্ম**—কর্ম; **লিপ্যতে**—বন্ধন করতে পারে; **নরে**—মানুষকে।

অনুবাদ

কেউ যদি এভাবেই কর্ম করে চলে, তা হলে সে শত বছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করতে পারে, কেন না ওই ধরনের কর্ম তাকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না। মানুষের এ ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

তাৎপর্য

কেউ মরতে চায় না এবং সকলেই যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকতে চায়। এই প্রবণতাটি কেবল ব্যক্তিগত মানুষেই নয়, সমষ্টিগত সম্প্রদায়ে, সমাজে এবং জাতিতে দেখা যায়। সমস্ত জীবই বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে এবং বেদে বলা হয়েছে যে, তা স্বাভাবিক। জীব স্বাভাবিকভাবে নিত্য, কিন্তু জড়-জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তাকে বার বার দেহ পরিবর্তন করতে হয়। এই পন্থাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এই দেহান্তরের কারণ *কর্মবন্ধন*। জীবকে জীবন ধারণের জন্য কর্ম করতে হয় কারণ সেটিই জড়া প্রকৃতির নিয়ম এবং সে যদি তার শাস্ত্র-নির্দেশিত কর্ম না করে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, তার ফলে তাকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়।

অন্যান্য সমস্ত জীবও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন মনুষ্য-শরীর লাভ করে, তখন সে এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটা সুযোগ পায়। কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাকে বলা হয় কর্ম। যে কর্ম আমাদের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার করে তাকে বলা হয় অকর্ম। আর স্বাধীনতার অপব্যবহার করে যে কর্ম করার ফলে মানুষ নিম্নতর জীবনে অধঃপতিত হয় তাকে বলা হয় বিকর্ম। এই তিন রকমের কর্মের মধ্যে যা জীবকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে, বুদ্ধিমান মানুষেরা সেই কর্মে ব্রতী হন। সাধারণ মানুষেরা স্বীকৃতি লাভের জন্য কিংবা এই জগতে অথবা স্বর্গলোকে উচ্চতর জীবন লাভের জন্য সৎকর্ম করে, কিন্তু যাঁরা উন্নত স্তরের মানুষ তাঁরা সর্বতোভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। বুদ্ধিমান মানুষরা ভালমতেই জানেন যে, সৎ ও অসৎকর্ম উভয়ই জীবকে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতে বেঁধে রাখে। ফলে তারা সেই কর্ম করতে চান, যার ফলে সৎ-অসৎ উভয় কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্রীঈশোপনিষদের উপদেশগুলি *ভগবদ্গীতায়* আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতাকে* অনেক সময় *গীতোপনিষদ* বা সমস্ত *উপনিষদের* সার বলে বর্ণনা করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত কর্ম না করে, কেউ নৈষ্কর্ম বা অকর্মের স্তরে উন্নীত হতে পারে না (*ভগবদ্গীতা* ৩/৯-১৬)। *বেদ* মানুষের কর্মশক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যার ফলে সে ক্রমশ পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তখন বুঝতে হবে সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছে। এই শুদ্ধ স্তরে অধিষ্ঠিত হলে তখন আর সত্ত্ব,

রজ ও তমোগুণ প্রভাবিত করতে পারে না, তখন নৈষ্কর্মের ভিত্তিতে কর্ম করা যায়। এই ধরনের কর্ম মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে না।

প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত কাউকে আর কিছু করতে হয় না। তা ছাড়া এই নিম্নতর জীবনে অকস্মাৎ ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, অথবা সম্পূর্ণরূপে সকাম কর্ম ত্যাগ করা যায় না। বদ্ধ জীবাত্মা তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম করতে অভ্যস্ত। সেই স্বার্থপর কর্ম সংকীর্ণ অথবা বিস্তৃত হতে পারে। সাধারণ মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য কর্ম করে, আর অন্যেরা তার সমাজের, জাতির ও দেশের জন্য বিস্তৃত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কর্ম করে। এই ধরনের বিস্তৃত স্বার্থপরগুলি সাম্যবাদ, জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, পরার্থবাদ এবং মানবিকতাবাদ ইত্যাদি আকর্ষণীয় নাম গ্রহণ করে। এই ধরনের 'মতবাদ'গুলি কর্মবন্ধনের আকর্ষণীয় রূপ। কিন্তু *ঈশোপনিষদের* বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, কেউ যদি সত্যি সত্যি এই ধরনের 'মতবাদ' বা আদর্শগুলি তাদের জীবনে গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি যেন সেগুলিকে ভগবৎ-কেন্দ্রিক করেন। সংসারী মানুষ হতে কোন ক্ষতি নেই; অথবা পরার্থবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, জাতীয়তাবাদী অথবা মানবতাবাদী হতেও ক্ষতি নেই, যদি তিনি কর্মগুলি *ঈশাবাস্য* বা ভগবানকে কেন্দ্র করে সম্পাদন করেন।

ভগবদ্গীতায় (২/৪০) বলা হয়েছে যে, ভগবৎ-কেন্দ্রিক কার্যকলাপ এতই মূল্যবান যে, তার অল্প অনুষ্ঠানও মানুষকে মহাভয় থেকে রক্ষা করে। জীবনের সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তনের চক্রে পুনরায় অধঃপতিত হওয়া। মানুষ যদি কোনক্রমে পারমার্থিক সুযোগ-সুবিধা হারায় যা দুর্লভ মানব-জীবনে লাভ করা যায় এবং পুনরায় বিবর্তনের চক্রে পতিত হয়, তা হলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত

দুর্ভাগা। তার বিকৃত ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাবে মূর্খ মানুষেরা দেখতে পারে না যে, সেগুলি ঘটছে। সুতরাং *শ্রীঈশোপনিষদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আমাদের শক্তিকে *ঈশাবাস্য* কার্যকলাপে প্রয়োগ করতে। সেই রকম কার্যকলাপ যুক্ত হলে আমরা বহু বছর বেঁচে থাকার বাসনা করতে পারি; তা না হলে সে আয়ু যত দীর্ঘ হোক না কেন, তার কোন মূল্যই নেই। একটি বৃক্ষ কয়েকশত বছর এমন কি কয়েক হাজার বছর বাঁচে, কিন্তু, গাছের মতো বাঁচা, হাপরের মতো নিঃশ্বাস নেওয়া, কুকুর ও শূকরের মতো সন্তান উৎপাদন করা, অথবা উটের মতো কন্টক ভক্ষণ করার কোন বিশেষত্ব নেই। ভগবৎ-কেন্দ্রিক সরল জীবন ভগবৎ-বিমুখ পরার্থবাদ অথবা সাম্যবাদের বিশাল ফাঁকি থেকে অনেক মূল্যবান।

পরার্থবাদীর কার্যকলাপ যখন *শ্রীঈশোপনিষদের* নির্দেশে সম্পাদিত হয়, তখন তা কর্মযোগে পরিণত হয়। সেই ধরনের কার্যকলাপের নির্দেশ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫-৯) দেওয়া হয়েছে, কেন না তা আমাদের জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তনের চক্রে পুনরায় পতিত হওয়া থেকে উদ্ধারের নিশ্চয়তা দেয়। এই ধরনের ভগবৎ-কেন্দ্রিক কার্যকলাপ যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাতেও কোনও ক্ষতি হয় না, কেন না সেই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি পরবর্তী জন্মে নিঃসন্দেহে অন্তত মনুষ্যজন্ম লাভ করেন। এভাবেই তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর একটি সুযোগ পান।

মন্ত্র তিন

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অসুর্যাঃ—অসুরদের জন্য; **নাম**—নামে বিখ্যাত; **তে**—তারা; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **অন্ধেন**—অজ্ঞানের দ্বারা; **তমসা**—অন্ধকারের দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আচ্ছন্ন; **তান্**—সেই সমস্ত গ্রহগুলি; **তে**—তারা; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **অভিগচ্ছন্তি**—প্রবেশ করে; **যে**—যে কেউ; **কে**—প্রত্যেকে; **চ**—এবং; **আত্ম-হনঃ**—আত্মার হননকারী; **জনাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

সে যেই হোক না কেন, আত্মঘাতী মানুষেরা মৃত্যুর পর অবশ্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন, তমস্যাবৃত অসুরলোকে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

মনুষ্যজীবনে যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তা পশুজীবনের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের পার্থক্য নিরূপণ করে। যারা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত এবং সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম করেন তাদের বলা হয় সুর; এবং যারা এই দায়িত্বের অবহেলা করে এবং সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাদের বলা হয় অসুর। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই এই দুই রকম মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুরেরা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং সেই অনুসারে কর্ম করেন। তাঁদের পন্থা সূর্যের গতিপথের মতো জ্যোতির্ময়।

বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের পর এবং বহু বহু জন্মান্তরের পর এই বিশেষ

শরীরটি আমরা লাভ করেছি। এই জড় জগৎকে কখনও কখনও একটি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং এই মনুষ্য-শরীরকে সেই সমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্র এবং তত্ত্ববেত্তা আচার্যদের সুদক্ষ কর্ণধারের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং মনুষ্য-শরীরলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলিকে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সাহায্যকারী অনুকূল বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে যদি কোন মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় পূর্ণরূপে ব্যবহার না করে, তা হলে তাকে অবশ্যই *আত্মহা,* অর্থাৎ আত্মঘাতী বলে বিবেচনা করা হয়। *শ্রীঈশোপনিষদে* স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আত্মঘাতী তারা নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

শূকর, কুকুর, উট, গাধা, সমস্ত পশুরা রয়েছে, যাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি আমাদেরই মতন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হয় অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও জঘন্য উপায়ে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করার সমস্ত সুযোগ পেয়েছে, কারণ মনুষ্যজীবন পশুজীবন থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। কুকুর, শূকর অথবা অন্যান্য পশুদের থেকে মানুষের জীবন অধিকতর উন্নত কেন? একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী একজন সাধারণ কেরানীর থেকে বেশি সুযোগ সুবিধে পায় কেন? তার উত্তর হচ্ছে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে একজন কেরানীর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়; সর্বদা উদর পূর্তির প্রচেষ্টায় ব্যস্ত পশুর থেকে মানুষের উচ্চতর কর্তব্য রয়েছে। তবুও আধুনিক আত্মঘাতী সভ্যতা কেবল ক্ষুধার্ত উদরের সমস্যা বৃদ্ধি করেছে। আমরা যখন আধুনিক সভ্য মানুষরূপী মার্জিত পশুকে জিজ্ঞেস করি, তার কাজ কী? তখন সে উত্তর দেয় যে, তার উদরের তৃপ্তিসাধন করার জন্য সে কেবলমাত্র কাজ করতে চায় এবং আত্মজ্ঞান লাভের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু

প্রকৃতির নিয়ম এতই নিষ্ঠুর যে, উদর পূর্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আগ্রহ সত্ত্বেও বেকার সমস্যা নিরন্তর বেড়েই চলেছে।

গর্দভ এবং শূকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করার জন্য আমরা এই মনুষ্য-শরীর পাইনি। মনুষ্য-শরীর পাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা। আমরা যদি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্নবান না হই, তা হলে না চাইলেও প্রকৃতির নিয়মে কঠোর পরিশ্রম করতে আমরা বাধ্য হব। এই যুগে মানুষ গাধা এবং ভারবাহী বলদের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে। যে সকল অঞ্চলে অসুরদের কঠোর পরিশ্রম করবার জন্য পাঠানো হয়, *শ্রীঈশোপনিষদের* এই মন্ত্রে সেই স্থানগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। মনুষ্যোচিত কর্তব্য সম্পাদনে বিফল হলে, মানুষকে অসুরলোকে পতিত হয়ে অজ্ঞান-অন্ধকারে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য কোন নিম্ন প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১-৪৩) বলা হয়েছে যে, যিনি আত্ম-উপলব্ধি সাধনের পথে অগ্রসর হয়ে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি, তিনি কোন *শুচি* অথবা *শ্রীমৎ* পরিবারে জন্ম লাভের সুযোগ পান। এখানে *শুচি* শব্দে অধ্যাত্মজ্ঞানে অগ্রসর ব্রাহ্মণগণকে এবং *শ্রীমৎ* শব্দে বৈশ্য অর্থাৎ বণিক সম্প্রদায়ের লোককেই বোঝানো হয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে, যিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে বিফল হয়েছেন, তাঁর পূর্ব জন্মকৃত আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে এক উচ্চতর সুযোগ প্রদান করা হয় যাতে তিনি আত্ম-উপলব্ধিতে উন্নতি সাধন করতে পারেন। একজন যোগভ্রষ্ট পুরুষ যদি কোন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারে জন্ম লাভের সুযোগ পান, তা হলে একজন সিদ্ধপুরুষের সৌভাগ্য তো কল্পনাতীত। শুধু ভগবানকে উপলব্ধির আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ পরজন্মে সম্পদশালী বা অভিজাত পরিবারে জন্মলাভ সুনিশ্চিত করতে পারে। অপর দিকে

বিষয়ভোগে মত্ত, চরম বিষয়ী এবং মায়াচ্ছন্ন যে ব্যক্তি ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টামাত্র করে না, সে নরকের তমসাবৃত স্থানে পতিত হয়, যা সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে। এই রকম বিষয়াসক্ত অসুরেরা মাঝে মাঝে ধর্মানুষ্ঠানের ভান করে, কিন্তু জড়-জাগতিক উন্নতিই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রবঞ্চনা, মূর্খ লোকেদের স্বীকৃতি এবং স্বীয় পার্থিব সম্পদের সহায়তায় তারা 'মহান'-শব্দে পরিগণিত হয় বলে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৭-১৮) এদের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। আত্মজ্ঞানহীন এবং ঈশ্বরভাবনারহিত এই সকল অসুর নিশ্চিতরূপে অন্ধকারতম লোকে পতিত হবে।

সিদ্ধান্ত এই যে, অনিত্য সংসারে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করাই মানুষের একমাত্র কাজ নয়, প্রকৃতির নিয়মে আমরা যে পার্থিব সংসারে পতিত হয়েছি, তার সকল সমস্যার সমাধান করাই আমাদের কর্তব্য।

মন্ত্র চার

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

অনেজৎ—স্থির; **একম্**—এক; **মনসঃ**—মন অপেক্ষা; **জবীয়ঃ**—অধিকতর বেগবান; **ন**—না; **এনৎ**—এই পরম ঈশ্বর; **দেবাঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **আপ্নুবন্**—প্রাপ্ত হন; **পূর্বম্**—পূর্ববর্তী; **অর্ষৎ**—দ্রুতগামী; **তৎ**—তিনি; **ধাবতঃ**—ধাবমান; **অন্যান্**—অন্য সকলকে; **অত্যেতি**—অতিক্রম করে; **তিষ্ঠৎ**—একস্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও; **তস্মিন্**—তাঁর মধ্যে; **অপঃ**—বৃষ্টি; **মাতরিশ্বা**—বায়ু এবং বৃষ্টির দেবতা; **দধাতি**—সরবরাহ করেন।

অনুবাদ

তাঁর ধামে যদিও তিনি স্থির, তবুও পরমেশ্বর ভগবান মন অপেক্ষা দ্রুতগামী এবং অন্যান্য ধাবমান সকলকে অতিক্রম করতে পারেন। শক্তিমান দেবতারা তাঁকে প্রাপ্ত হন না। বায়ু ও বারি প্রদানকারী দেবতাগণের নিয়ামক পরমেশ্বর ভগবান একস্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য সকলকেই অতিক্রম করে যান।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরাও মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁকে জানতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, মনের গতিতে গমনে সক্ষম একজন অভক্ত দার্শনিক শত শত বৎসর ভ্রমণের পরেও দেখবেন, পরমতত্ত্ব তাঁর চেয়ে বহু দূরে অবস্থান করছে।

শ্রীঈশোপনিষদের বর্ণনা অনুসারে, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ধামকে বলা হয় কৃষ্ণলোক, যেখানে তিনি সর্বদাই তাঁর অপ্রাকৃত লীলায় নিরত থাকেন। তবুও তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রবাহে তিনি যুগপৎ তাঁর সৃজনী শক্তির প্রতিটি অংশে প্রকটিত হতে পারেন। *বিষ্ণু পুরাণে* তাঁর শক্তিকে অগ্নির উত্তাপ ও আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটি মাত্র স্থানে অবস্থিত হয়েও, অগ্নি সর্বত্র উত্তাপ ও আলোক বিকিরণ করতে সক্ষম হয়; তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত ধামে অবস্থান করেও তাঁর বিবিধ শক্তিকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে সক্ষম।

পরমেশ্বরের শক্তি অসংখ্য হলেও তাদের তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির প্রত্যেকটির শত শত লক্ষ লক্ষ উপবিভাগ আছে। প্রভুত্বকারী দেবতা যাঁরা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, যেমন—বায়ু, আলোক, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে এবং পরিচালনায় ক্ষমতা প্রাপ্ত, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। মনুষ্যসহ সমস্ত জীবাত্মাও ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত। এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত এবং চিদাকাশ বা ভগবৎ-ধাম তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

এভাবেই পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তি সর্বত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। যদিও ভগবান এবং তাঁর শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবু কারও ভ্রান্ত ধারণা করা উচিত নয় যে, ভগবান নির্বিশেষ রূপেই সর্বত্র বিরাজিত, অথবা তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তা হারিয়েছেন। মানুষ মাত্রই তার বুদ্ধিমত্তা এবং বোধশক্তি অনুসারেই কোন সিদ্ধান্ত করতে অভ্যস্ত, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সীমিত উপলব্ধির অতীত। এই কারণেই *উপনিষদে* আমাদের এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অবাঙ্‌মনসগোচর*, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত।

ভগবদ্গীতায় (১০/২) ভগবান বলেছেন, এমন কি মহান ঋষি এবং দেবতারাও তাঁকে জানতে পারেন না। সুতরাং ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞ অসুরদের কথা বলাই বাহুল্য। এই চতুর্থ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন অন্তিকে পরম ব্যক্তি; তা না হলে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সবিশেষ রূপের সমর্থনে নানাবিধ লক্ষণ উল্লেখের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

যদিও-বা ভগবানের সমস্ত লক্ষণ তাঁদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ভগবানের স্বতন্ত্র শক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশগুলির কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সেই জন্য এই অংশগুলি কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না এবং ভগবানের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করতেও পারে না। মূর্খ ও নির্বোধ জীব, যারা পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত থেকেই ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি অনুমান করার বিফল চেষ্টা করে। মনোধর্মের দ্বারা ভগবানের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ প্রয়াসীদের *শ্রীঈশোপনিষদ* এই শ্লোকে সতর্ক করেছেন। *বেদ*-এর মতো শ্রেষ্ঠ উৎস থেকেই ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ জানার চেষ্টা করা উচিত, কেন না তা অপ্রাকৃত জ্ঞানের আকর।

পরম পূর্ণের প্রতিটি অংশ তার বিশেষ শক্তি অনুসারে নির্ধারিত কাজ করতেই আদিষ্ট। কিন্তু সেই অংশ যখন তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তখন সে মায়ার বশীভূত বলে বিবেচিত হয়। ভগবানের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য এভাবেই শুরু থেকেই *শ্রীঈশোপনিষদ* আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, স্বতন্ত্র আত্মার তার নিজস্ব কোনও উদ্যম থাকবে না। যেহেতু সে, ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাকেও ভগবানের উদ্যমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হয়। সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। বুদ্ধিমত্তা সহকারে কেউ যখন তার ক্ষমতা বা অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করে এবং বুঝতে পারে যে, সবকিছুই

ভগবানের শক্তি, তখন সে তার প্রকৃত চেতনা জাগরিত করতে পারে, যা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে অপহৃত হয়েছিল।

পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেন, তখন তাঁর ইচ্ছা সম্পাদনে তা ব্যবহার করতে হবে, অন্যভাবে নয়। ভগবানের প্রতি আনুগত্য দ্বারাই কেবলমাত্র তাঁকে জানা যায়। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে তাঁর স্বরূপকে জানা, তাঁর শক্তিগুলিকে জানা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই শক্তিগুলি কিভাবে কাজ করে তা জানা। সকল *উপনিষদের* সারাতিসার *ভগবদ্গীতায়* এই সব বিষয়বস্তু পরমেশ্বর ভগবান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে ।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

তৎ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **এজতি**—সচল; **তৎ**—তিনি; **ন**—না; এজতি—সচল; তৎ—তিনি; **দূরে**—দূরে; **তৎ**—তিনি; **উ**—ও; **অন্তিকে**—অতি নিকটে; **তৎ**—তিনি; **অন্তঃ**—অন্তরে; **অস্য**—এর; **সর্বস্য**—সব কিছুর; **তৎ**—তিনি; **উ**—ও; **সর্বস্য**—সব কিছুর; **অস্য**—এর; **বাহ্যতঃ**—বাইরেও।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা যে অপ্রাকৃত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরস্পর-বিরোধী কথা উল্লেখ করে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রমাণ করা হয়েছে। তিনি সঞ্চরণশীল এবং সঞ্চরণশীল নন। এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী উক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারি না। আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করতে পারি। মায়াবাদ সম্প্রদায়ের নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের নির্বিশেষ কার্যকলাপ মাত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁর সবিশেষ রূপকে

বাতিল করে দেন। কিন্তু ভাগবত সম্প্রদায় ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় রূপকেই স্বীকার করেন। ভাগবতগণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তিসমূহকেও স্বীকার করেন, কেন না এই শক্তিসমূহ ব্যতিরেকে 'পরমেশ্বর' কথাটির কোন অর্থই হয় না।

যেহেতু আমরা ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন করতে পারি না, আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, তাই ভগবানের কোনও সবিশেষ সত্তা নেই। এই যুক্তি খণ্ডন করে *শ্রীঈশোপনিষদ* আমাদের সতর্ক করেছেন যে, ভগবান যেমন আমাদের থেকে অতি দূরে তেমনি তিনি অতি নিকটেও অবস্থান করেন। ভগবানের ধাম জড় আকাশ থেকে বহু দূরে এবং এমন কি এই জড় আকাশ পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। জড় আকাশ যদি বহু বহু দূর বিস্তৃত হয়, তা হলে জড় আকাশের অতীত চিদাকাশকে জানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চিদাকাশ যে জড় ব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরে অবস্থিত, তা *ভগবদ্গীতায়ও* (১৫/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু ভগবান এত দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, মুহূর্তমধ্যে তিনি বায়ু অথবা মন অপেক্ষা দ্রুত গতিতে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি এত দ্রুত চলতে পারেন যে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। এই বিষয়টি পূর্বোক্ত মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবুও ভগবান যখন আমাদের কাছে আবির্ভূত হন তখন আমরা তাঁকে অবজ্ঞা করি। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান এই বিচার-বুদ্ধিহীন অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে, মূর্খরাই কেবল তাঁকে মরণশীল ব্যক্তি বলে অনুমান করে উপহাস করে। (গীতা ৯/১১) তিনি মরণশীল ব্যক্তি নন, তেমনই তিনি আমাদের সামনে জড়া প্রকৃতিজাত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন না। তথাকথিত অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা মনে করেন, ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জড়দেহ ধারণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য

শক্তির কথা না জেনেই, মূর্খরা ভগবানকে সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করে।

অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন বলে ভগবান যে কোন উপায়েই আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত করতে পারেন। অবিশ্বাসীরা তর্ক করে যে, ভগবান-স্বয়ং কোন মতেই মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেন না এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তিনি জড়া প্রকৃতিজাত রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। এমন কি ভগবান যদি জড়া প্রকৃতির আকার নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিতও হন, তবুও তাঁর পক্ষে সেই জড় শক্তিকে চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করা খুব সহজ। যেহেতু জড়া ও পরা শক্তি উভয়েরই উৎস এক, তাই উৎসের ইচ্ছা অনুসারেই শক্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, ভগবান মাটি, পাথর কিংবা কাঠের অর্চা-বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন। এই সমস্ত শ্রীবিগ্রহ কাঠ, পাথর বা অন্য কোন পদার্থ থেকে প্রকাশিত হলেও তা দেবমূর্তি নয়, যা অপৌত্তলিকরা দাবি করেন।

আমাদের বর্তমান অসম্পূর্ণ প্রাকৃত অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত দর্শন-শক্তির কারণে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারি না। কিন্তু ভগবৎ-দর্শনে ইচ্ছুক জড় দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি কৃপা করে তথাকথিত জড় বিগ্রহ-রূপে তাঁদের সেবা গ্রহণের জন্য আবির্ভূত হন। কারও মনে করা উচিত নয় যে, যারা পৌত্তলিক তাঁরা ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম পর্যায়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবৎ উপাসনাই করছেন এবং তিনি তাঁদের কাছে সহজগম্যভাবে আবির্ভূত হতে সম্মত হয়েছেন। অর্চা-বিগ্রহ উপাসকের মনগড়া নয়, তা তাঁর সকল আনুষঙ্গিক সহ নিত্য বর্তমান। একমাত্র শুদ্ধ অন্তঃকরণ- বিশিষ্ট ভক্তই এই সত্য অনুধাবন করতে পারেন, নাস্তিকের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

ভগবদ্‌গীতায় (৪/১১) শ্রীভগবান বলেছেন যে, ভক্তের শরণাগতির মাত্রা অনুসারেই তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। তাঁর শরণাগত ভক্ত ভিন্ন অন্য কারও কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং শরণাগত ভক্তের কাছে তিনি অত্যন্ত সুলভ, কিন্তু যারা শরণাগত নয়, তাদের কাছ থেকে তিনি বহু বহু দূরে অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে তিনি একান্তই দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বর্ণিত *সগুণ* এবং *নির্গুণ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সগুণ* শব্দের অর্থ এই নয় যে, ভগবান যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন হন, যদিও তিনি উপলভ্য এবং প্রাকৃত রূপেই আবির্ভূত হন। সকল শক্তির উৎস হওয়ায়, তাঁর কাছে জড়া শক্তি ও চিন্ময় শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নেই। সকল শক্তির নিয়ন্তা বলে, আমাদের মতো তিনি কখনও সেই শক্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। জড় শক্তি তাঁর নির্দেশেই কাজ করে; তাই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জড় শক্তিকে চালনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও এই জড় শক্তির গুণদ্বারা প্রভাবিত হন না। আবার পরিশেষে তিনি কখনও নিরাকার হয়ে যান না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহ-সম্পন্ন আদিপুরুষ। তাঁর নির্বিশেষ রূপ বা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর দেহনিঃসৃত জ্যোতি, ঠিক যেমন—সূর্যরশ্মি হচ্ছে সূর্যদেবতার দেহনিঃসৃত জ্যোতি।

প্রহ্লাদ মহারাজ শৈশবে যখন তাঁর ঘোর নাস্তিক পিতা হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে ছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার ভগবান কোথায়?" প্রহ্লাদ মহারাজ যখন উত্তর দিলেন, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন তাঁর পিতা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর ঈশ্বর এই রাজপ্রাসাদের কোন একটি স্তম্ভের মধ্যে আছে কি না। এবং শিশু প্রহ্লাদ বললেন, "হ্যাঁ আছেন।" তৎক্ষণাৎ সেই নাস্তিক অসুর তাঁর সম্মুখে স্তম্ভটি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করলে তার ভিতর থেকে তৎক্ষণাৎ

অর্ধ নর, অর্ধ সিংহ অবতার নৃসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এভাবেই ভগবান সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন। ভগবান নৃসিংহ ফটিক স্তম্ভের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্যে, নাস্তিক হিরণ্যকশিপুর আদেশে নয়। একজন নাস্তিক ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদেশ করতে পারে না, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য সব সময়, সর্বত্র আবির্ভূত হন। তেমনই, *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের রক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের বিনাশ করবার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। অবশ্যই নাস্তিকদের বিনাশ করবার জন্য তাঁর যথেষ্ট শক্তি এবং প্রতিনিধি রয়েছে, কিন্তু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে তিনি গভীর আনন্দ লাভ করেন। তাই তিনি অবতার রূপে আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ ছাড়া তাঁর অবতরণের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ব্রহ্মসংহিতায় কথিত আছে যে, আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ তাঁর অংশরূপে সমস্ত কিছুতেই প্রবেশ করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর বিরাটরূপে সমস্ত কিছুর বাইরে অবস্থান করেন এবং অন্তর্যামীরূপে সব কিছুর অন্তরেও বিরাজ করেন। অন্তর্যামীরূপে তিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী হন এবং আমাদের সকল কর্মের কর্মফল প্রদান করেন। আমাদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কথা আমরা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ভগবান সকল কর্মের সাক্ষী হওয়ার ফলে আমাদের কৃতকর্ম অনুসারে সকল কর্মফল আমাদের ভোগ করতেই হবে।

বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, অন্তরে এবং বাইরে পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। সমস্ত কিছুই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন উত্তাপ ও আলোক আগুন থেকে নির্গত হয় এবং এভাবেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর সবিশেষ রূপে তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্ষুদ্র জীবাত্মার ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত কিছুই ভোগ করেন।

মন্ত্র ছয়

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি; তু—কিন্তু; সর্বাণি—সমস্ত; ভূতানি—জীবসকল; আত্মনি—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত; এব—কেবলমাত্র; অনুপশ্যতি—নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে দর্শন করেন; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীবের মধ্যে; চ—এবং; আত্মানম্—পরমাত্মা; ততঃ—তার পরে; ন—না; বিজুগুপ্সতে—কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন।

অনুবাদ

যিনি সব কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জীবকে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোনও কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।

তাৎপর্য

এটি মহাভাগবতের বর্ণনা, যিনি সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেখেন। ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করার বিষয়ে তিনটি স্তর আছে। উপলব্ধির নিম্নস্তর পর্যায়ে যিনি আছেন, তিনি কনিষ্ঠ-অধিকারী। তিনি মন্দির, গির্জা অথবা মসজিদে গিয়ে শাস্ত্রবিধি ও স্বীয় ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আরাধনা করেন। এই প্রকার ভক্ত মনে করেন যে, ভগবান একমাত্র আরাধনার স্থল বা মন্দিরেই আছেন, অন্যত্র কোথাও নেই। ভগবদ্ভক্তির কে কোন্ স্তরে আছেন তা তিনি বিচার করতে পারেন না এবং বলতেও পারেন না কে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই ধরনের ভক্তরা উপাসনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক

নিয়ম পালন করেন মাত্র এবং ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে একটি বিধিকে অন্য কোনও বিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করে নিজেদের মধ্যে কলহ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারীরা হচ্ছেন প্রাকৃত ভক্ত, কারণ তাঁরা প্রাকৃত স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে উপনীত হতে সচেষ্ট মাত্র।

ভগবৎ সুদৃঢ়োপলব্ধির দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় মধ্যম-অধিকারী। এই সমস্ত ভক্তরা ভগবৎ সম্বন্ধে চারটি নিয়ম পালন করেন—(১) প্রথমে তাঁরা ভগবানকে সেবা করেন। (২) তারপর তাঁরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। (৩) তাঁরা ভগবৎ বিষয়ে অজ্ঞ সরল প্রকৃতির ব্যক্তিদের কৃপা করেন। (৪) সর্বশেষে তাঁরা ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিককে উপেক্ষা করেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী মধ্যম অধিকারীরা ভিন্নভাবে আচরণ করেন। তিনি ভগবানকে 'প্রেমের ঠাকুর' রূপেই ভজনা করেন এবং ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সখ্য স্থাপন করেন। তিনি অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম জাগরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু ভগবানের নাম উপহাসকারী নাস্তিকদের কাছে তিনি কখনও যান না।

ভগবৎ উপলব্ধির তৃতীয় স্তরে হচ্ছেন উত্তম-অধিকারী, যিনি সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর সম্বন্ধযুক্ত দেখেন। এই প্রকার ভক্ত আস্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে কোনও বিভেদ জ্ঞান করেন না, বরং সকলকেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন। তিনি জানেন, একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটি পথের কুকুরের কোন ভেদ নেই, কারণ উভয়েই ভগবানের অংশ, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তারা ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়েছে মাত্র। তিনি দর্শন করেন যে, পরমেশ্বরের ব্রাহ্মণ অংশটি ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করেননি, কিন্তু কুকুর অংশটি তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে, এবং তাই প্রকৃতির অপ্রতিহত নিয়মেই সে এখন অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হয়ে দণ্ডভোগ করছে।

কুকুর ও ব্রাহ্মণের নিজ-নিজ কর্মের বিচার না করে উত্তম-অধিকারী তাদের উভয়েরই কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। এই প্রকার উত্তম অধিকারী সুশিক্ষিত ভক্তেরা কোন প্রাকৃত দেহ দর্শন করে বিপথগামী হন না, পক্ষান্তরে প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত চিন্ময় স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আকর্ষিত হন।

যাঁরা উত্তম অধিকারীর অনুকরণ করে সকলের প্রতি আপাত সমদৃষ্টি-সম্পন্ন বিচার করেন, অথচ দৈহিক সম্বন্ধে বিভিন্ন জীবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার করেন, তাঁরা ভণ্ডবিশ্বপ্রেমিক। উত্তম অধিকারী ভক্তের কাছেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করতে হবে, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সর্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ পরমাত্মা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে নয়।

এই ষষ্ঠ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যথার্থ দর্শন করতে হবে। তার অর্থ প্রকৃত শিক্ষক পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে *অনুপশ্যতি* সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। *পশ্যতি* শব্দটির অর্থ পর্যবেক্ষণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, চর্মচক্ষুর সাহায্যে দেখার মতোই সে সব কিছু দর্শন করতে চেষ্টা করবে। জড়-জাগতিক ত্রুটির জন্য চর্মচক্ষু কোনও কিছুই যথার্থভাবে দেখতে পারে না। উন্নততর উৎস থেকে শ্রবণ করতে না পারলে মানুষ সঠিকভাবে কিছু দর্শন করতে পারে না এবং ভগবানের মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উৎস। বৈদিক তত্ত্ব গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস এবং ব্যাস থেকে অন্যান্য শিষ্যেরা—এভাবেই নেমে এসেছে। পুরাকালে বৈদিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি, কারণ সেই যুগের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী এবং স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের পারমার্থিক গুরুর নির্দেশাবলী একবার মাত্র শুনেই তা স্মরণ রাখতে পারতেন।

আজকাল শাস্ত্রসমূহের বহু টীকা-ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই বৈদিক জ্ঞানের শিক্ষক ব্যাসদেবের কাছ থেকে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় আগত নয়। শ্রীল ব্যাসদেবের সর্বশেষ, সম্পূর্ণ এবং মহত্তম রচনা *শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের* প্রামাণিক ভাষ্য। স্বয়ং ভগবানের মুখ-নিঃসৃত *ভগবদ্‌গীতা* শ্রীল ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেন। এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং যে-সমস্ত অন্য ভাষ্য *গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মৌলিক শিক্ষার বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপন্ন করে, সেই ভাষ্যগুলি অবৈধ। *বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান এবং শ্রীল ব্যাসদেবের প্রবর্তিত শিক্ষাধারার আচার্যবৃন্দের কাছ থেকে অথবা অন্তত পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে শিক্ষা না পেয়ে কারও বেদ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।

ভগবদ্‌গীতা (৬/৯) অনুসারে কেবলমাত্র মুক্ত আত্মাই উত্তম-অধিকারী ভক্ত এবং তিনি সকলকে ভ্রাতৃস্বরূপ দর্শন করেন। জড়-জাগতিক উন্নতির পশ্চাতে সর্বদা ধাবিত রাজনৈতিক নেতাদের এই দৃষ্টিশক্তি থাকে না। যখন কেউ উত্তম-অধিকারীর লক্ষণগুলির অনুকরণ করে, তখন সে নাম-যশ এবং জাগতিক লাভের জন্য তার জড় দেহটির সেবা করতে পারে, কিন্তু সে চিন্ময় আত্মার সেবা করতে পারে না। এই সকল অনুকরণকারীরা চিন্ময় জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না। উত্তম-অধিকারী ভক্ত জীবের চিন্ময় আত্মাকে দর্শন করে তাঁর চিন্ময় স্বরূপের সেবা করেন। এভাবেই তাঁর জড়-জাগতিক কর্তব্যগুলি আপনা থেকেই সাধিত হয়।

মন্ত্র সাত

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন্—যেই অবস্থায়; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসকল; **আত্মা**—চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ; **এব**—কেবল; **অভূৎ**—যেমন বিদ্যমান থাকে; **বিজানতঃ**—যিনি জানেন তাঁর; **তত্র**—তাতে; **কঃ**—কি; **মোহঃ**—মোহ; **কঃ**—কি; **শোকঃ**—শোক; **একত্বম্**—গুণগত একত্ব; **অনুপশ্যতঃ**—আচার্যের শিক্ষা অনুসারে দর্শনকারীর, অথবা ওইভাবে যিনি নিরন্তর দর্শন করেন।

অনুবাদ

যিনি সর্বদা সমস্ত জীবকে ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে অভিন্ন চিৎকণা-স্বরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী। তাঁর শোকই বা কি? মোহই বা কি?

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, মধ্যম-অধিকারী এবং উত্তম-অধিকারী ব্যতীত কেউই জীবাত্মার স্বরূপকে যথাযথভাবে জানতে পারেন না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন গুণগতভাবে আগুনের সঙ্গে এক, তেমনই জীবাত্মাও গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক। কিন্তু আয়তন অনুসারে আগুন এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ এক নয়, কেন না স্ফুলিঙ্গের আলো এবং উত্তাপের পরিমাণ আগুনের সমান নয়। মহাভাগবত বা মহান ভক্ত একত্বকে এভাবে অনুভব করেন যে, তিনি সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিরূপে দর্শন করেন। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, তাই সেটাই একত্বের অর্থ। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে আলো এবং উত্তাপ আগুন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন

হলেও আলোক এবং উত্তাপ ছাড়া 'আগুন' শব্দটির কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে আলো, উত্তাপ এবং আগুন মূলত অভিন্ন।

একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—এই শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল জীবগণের মধ্যে একত্ব দর্শন করতে হবে। পরম পূর্ণের এক একটি ক্ষুদ্র কণিকায় ভগবৎ-সত্তার গুণাবলীর শতকরা আশি ভাগ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পরিমাণগতভাবে তারা ভগবানের সমান নয়। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলে ওই গুণগুলি অণু পরিমাণে জীবাত্মার মধ্যে বর্তমান। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, সমগ্র সমুদ্রের জলে মিশ্রিত লবণ এবং সেই সমুদ্রের একবিন্দু জলে মিশ্রিত লবণের পরিমাণের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না, কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণের গুণগত বিচারে সমুদ্রের একবিন্দু জলের লবণের সঙ্গে পূর্ণ সমুদ্রের লবণের কোন পার্থক্য নেই। গুণ ও পরিমাণগত বিচারে যদি জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমান হত, তা হলে তার জড় শক্তির প্রভাবাধীন হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জীবাত্মা, এমন কি শক্তিশালী দেবতারাও কোন বিষয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না; অতএব, জীবাত্মা সকল বিষয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমান এটি *একত্বম্* শব্দের অর্থ নয়, যদিও ব্যাপক অর্থে তাদের উদ্দেশ্য এক। যেমন একটি পরিবারের সকলের স্বার্থই এক, অথবা বহু মতাবলম্বী মানুষ থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের জাতীয় স্বার্থ একটিই। জীবাত্মা-সমূহ একই পরম পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরমেশ্বর ও তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশের স্বার্থ অভিন্ন। প্রত্যেক জীব মাত্রই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সন্তান। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৩-৪) বর্ণিত আছে—পশু-পক্ষী, জলচর প্রাণী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ, পিপীলিকা ইত্যাদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীই পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত তাই সকলেই ভগবৎ পরিবারভুক্ত। পারমার্থিক জীবনে পারস্পরিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের কোন সংঘাত নেই।

চিন্ময় স্বরূপের ধর্মই আনন্দ অনুভব। স্বভাবত এবং স্বরূপগত পরমেশ্বর ভগবান সহ সকল জীবাত্মা এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশসকল শাশ্বত আনন্দময়। অস্থায়ী জড় জগতে আবদ্ধ জীবেরা নিরন্তর সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু তারা ভুল পথে অন্বেষণ করছে। এই জড় জগতের বাইরে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর অনন্ত পার্ষদসহ নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। ওই চিন্ময় স্তরে প্রাকৃত গুণাবলীর অবস্থিতি নেই, তাই ওই স্তরকে বলা হয় নির্গুণ। এই নির্গুণ স্তরে আনন্দের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। জড় জগতে আনন্দের মূল কেন্দ্র অনুপস্থিত বলে এখানে একের সঙ্গে অপরের সংঘাত দেখা যায়। শাশ্বত আনন্দের মূল কেন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহান ও অপ্রাকৃত রাসনৃত্যের মূল কেন্দ্র। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সংঘাতহীন এক অপ্রাকৃত স্বার্থ সমন্বিত হয়ে জীবন উপভোগ করা। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক স্বার্থের সর্বোচ্চ স্তর এবং এই একত্বের স্বরূপ যেমাত্র কেউ উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ মায়া বা শোকের কোন প্রশ্ন থাকে না।

মায়া বা বিভ্রম থেকেই নিরীশ্বরবাদী সভ্যতার উৎপত্তি এবং এই সভ্যতার চূড়ান্ত ফল, দুঃখ-শোক। বর্তমান রাজনীতিবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রবর্তিত ঈশ্বরবিহীন সভ্যতা উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ; সেটিই প্রকৃতির নিয়ম। *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) অনুসারে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা ছাড়া অন্যেরা প্রকৃতির কঠোর বিধানকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভয়, উদ্বেগ এবং সকল প্রকার ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে, বিচিত্র স্বার্থের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হলে আমাদের সকল কর্মকে ভগবৎ সম্বন্ধে যুক্ত করতে হবে।

আমাদের কর্মফলকে অবশ্যই শ্রীভগবানের স্বার্থ সাধনে নিয়োগ করতে হবে—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কেবলমাত্র সেবার দ্বারা ভগবানের স্বার্থ সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা *আত্মভূত* স্বার্থ উপলব্ধি

করতে পারি, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত *আত্মভূত* স্বার্থ এবং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বর্ণিত *ব্রহ্মভূত* স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। পরম আত্মা হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, আর অণু আত্মা হচ্ছে জীব। পরমাত্মা একাই স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবসমূহকে প্রতিপালন করেন, কেন না পরমেশ্বর ভগবান তাদের প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চান। পিতা তাঁর সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাদের প্রতিপালন করে আনন্দিত হন। সন্তান-সন্ততি পিতার অনুগত এবং বাধ্য হলে একই স্বার্থে সুখময় পরিবেশে পারিবারিক জীবনধারা স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। একই পদ্ধতিতে পরমাত্মা, পরব্রহ্মের পরম পরিবারও অপ্রাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত।

স্বতন্ত্র আত্মার মতো পরব্রহ্মও একজন সবিশেষ ব্যক্তি। ভগবান বা জীবেরা কেউই নিরাকার বা নির্বিশেষ নন। এই প্রকার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। সেটিই চিন্ময় সত্তার প্রকৃত স্বরূপ। যেমাত্র কেউ এই অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হয়, তৎক্ষণাৎ সে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে। তবে এই ধরনের মহাত্মা জগতে দুর্লভ, কারণ বহু জন্মের সাধনায় এই প্রকার অপ্রাকৃত উপলব্ধি অর্জিত হয় (*গীতা* ৭/১৯)। একবার এই অপ্রাকৃত চেতনা লাভ হলে এই মায়া, মোহ, দুঃখ এবং যন্ত্রণাপূর্ণ জীবন-মৃত্যুর ধারার অবসান ঘটে। *শ্রীঈশোপনিষদের* এই মন্ত্র থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করি।

মন্ত্র আট

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্ যাথা-
তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **পর্যগাৎ**—তত্ত্বতঃ জানা কর্তব্য; **শুক্রম্**—সর্বশক্তিমান; **অকায়ম্**—অদেহী; **অব্রণম্**—নিষ্কলঙ্ক; **অস্নাবিরম্**—শিরাহীন; **শুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **অপাপ-বিদ্ধম্**—অপাপবিদ্ধ; **কবিঃ**—সর্বজ্ঞ; **মনীষী**—মনীষী; **পরিভূঃ**—সব চাইতে মহৎ; **স্বয়ম্ভূঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **যাথাতথ্যতঃ**—কেবল অনুসারে; **অর্থান্**—ঈপ্সিত; **ব্যদধাৎ**—পুরস্কার; **শাশ্বতীভ্যঃ**—স্মরণাতীত; **সমাভ্যঃ**—সময়।

অনুবাদ

এইপ্রকার ব্যক্তি তত্ত্বত সর্বশ্রেষ্ঠ অদেহী, সর্বজ্ঞ, নিষ্কলঙ্ক, শিরাহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনীষীকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে অদ্বয়জ্ঞান পরমপুরুষ ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এই বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান নিরাকার নন। তাঁর নিজস্ব অপ্রাকৃত রূপ আছে এবং সেই রূপ মোটেই পার্থিব জগতের রূপের অনুরূপ নয়। এই জড় জগতে জীবের রূপসমূহ মূর্তকরণ করেছেন জড়া প্রকৃতি এবং তারা যন্ত্রের মতোই কাজ করে। শিরা-ধমনী ইত্যাদি সহ জীবদেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

গঠন অবশ্যই যন্ত্রের মতো, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত দেহে ধমনী-শিরাদি কিছুই নেই। এই মন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তিনি অরূপ বিগ্রহ, অর্থাৎ তাঁর দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। আমাদের মতো কোনও প্রাকৃত গুণময় দেহ তিনি ধারণ করেন না। দৈহিক জীবনের জড়-জাগতিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম মন ও স্থূল দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন। কিন্তু শ্রীভগবান—এই রকম বিভেদ থেকে ভিন্ন। ভগবানের দেহে এবং মনে কোনও ভেদ নেই তিনি পূর্ণ এবং তাঁর মন, দেহ ও স্বয়ং তিনি এক ও অভিন্ন।

ব্রহ্মসংহিতায় ভগবানের এই রকম বর্ণনা আছে। সেখানে তাঁকে সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা অর্থ করে যে, তাঁর নিত্যরূপ অপ্রাকৃত অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রকাশ করে। বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, তাঁর দেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এভাবেই তাঁকে কখনও কখনও অরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অরূপের অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর আমাদের মতন রূপ নেই, এবং আমরা যেই রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তিনি সেই রূপ বর্জিত। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বলা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সমস্ত কিছুই করতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, তার দেহের যে-কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্য যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে তিনি পারেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর হাত দিয়ে হাঁটতে পারেন, তাঁর পা দিয়ে যে-কোন জিনিস গ্রহণ করতে পারেন, হাত ও পা দিয়ে দর্শন করতে পারেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে ভোজন করতে পারেন ইত্যাদি। *শ্রুতি* মন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, ভগবানের যদিও আমাদের মতো হাত ও পা নেই, কিন্তু তাঁর ভিন্ন ধরনের হাত-পা রয়েছে যার দ্বারা তিনি আমাদের নিবেদিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে ধাবিত হতে পারেন। এই অষ্টম মন্ত্রে শুক্রম্ (সর্বশক্তিমান) শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সব অপ্রাকৃত গুণাবলী তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

অধিকারী আচার্যবৃন্দ পূজার্চনার্থে মন্দিরে যে শ্রীবিগ্রহ (অর্চা-বিগ্রহ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাঁরা সপ্তম মন্ত্র অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি করেন, সেই বিগ্রহের সঙ্গে ভগবানের আদি স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের আদি স্বরূপ এবং তিনি বলদেব, রাম, নৃসিংহ, বরাহ ইত্যাদি অসংখ্য রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই সমস্ত রূপ সেই একই পরমেশ্বর ভগবান।

তেমনই, মন্দিরে পূজিত অর্চাবিগ্রহই ভগবানের প্রকাশ্য-রূপ। অর্চা-বিগ্রহ উপাসনা দ্বারা ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের সম্মুখীন হন এবং ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। শুদ্ধাত্মা আচার্যবৃন্দের প্রার্থনায় ভগবানের অর্চা-বিগ্রহ অবতরণ করেন এবং ভগবানের অসীম শক্তি দ্বারা ভগবানের আদি স্বরূপের মতো ক্রিয়া করেন। *শ্রীঈশোপনিষদ* ও *শ্রুতি মন্ত্র* সম্বন্ধে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ ভক্তের উপাস্য অর্চা-বিগ্রহকে জড় উপাদানে গঠিত বলে বিবেচনা করে। কনিষ্ঠ-অধিকারী বা মূর্খ ব্যক্তিদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে এই অর্চা-বিগ্রহ জড় বলেই বিবেচিত হলেও এই সব মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবান সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জড়কে চেতন এবং চেতনকে জড়ে পরিণত করতে পারেন।

ভগবদ্গীতায় (৯/১১, ১২) ভগবান পতিত ব্যক্তিদের স্বল্প জ্ঞানের জন্য আক্ষেপ করেছেন, তারা মনে করে, ভগবান যেহেতু একজন মানুষের মতো এই জগতে অবতরণ করেন, তাই ভগবানের দেহ জড়। এই সমস্ত স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে অবগত নয়। তাই কূট-তার্কিকের কাছে ভগবান নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকট করেন না। কেবলমাত্র তাঁর প্রতি কারও শরণাগতির মাত্রা অনুসারেই তাঁকে অনুভব করা যায়। সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ সম্বন্ধে বিস্মৃতিই জীবসমূহের সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ।

এই মন্ত্রে এবং অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অনন্তকাল থেকে ভগবান জীবকুলকে তাঁর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে আসছেন। প্রথমে জীব কোনও কিছু ইচ্ছা করে এবং ভগবান তার যোগ্যতা অনুসারে সেই বাসনার বিষয়গুলি সরবরাহ করেন। কোন মানুষ যদি প্রধান বিচারালয়ের বিচারক হতে চান, তা হলে তাঁকে শুধু বিচারকের গুণসম্পন্ন হলেই চলবে না, তাঁকে বিচার বিধায়ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের উপরেও নির্ভর করতে হবে। বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়। সেই পদ কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অবশ্যই লাভ করতে হবে। তেমনই, শ্রীভগবানও জীবের যোগ্যতার অনুপাতে অথবা তার কর্মফল অনুসারে তাকে সুখ প্রদান করেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি শুধু তার যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে না, তাকে পরমেশ্বর ভগবানের করুণাও অর্জন করতে হবে।

সাধারণত জীব জানেই না ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে কিংবা কোন্ পদ যাচ্ঞা করা বিধেয়। যখন জীব তার স্বরূপের পরিচয় পায়, তখন সে ভগবানের চিন্ময় প্রেমভক্তি সম্পাদনের জন্য তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য সঙ্গ কামনা করে। দুর্ভাগ্যবশত, জড়া-প্রকৃতির প্রভাবাধীন জীবকুল অন্য অনেক কিছুই প্রার্থনা করে এবং *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) তাদের মানসিকতা বহির্মুখী বহু শাখাবিশিষ্ট বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্ময় বুদ্ধি এক, কিন্তু জাগতিক বুদ্ধি বহুধা বিভক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত আছে যে, বহিরঙ্গা শক্তির অনিত্য সৌন্দর্যে মোহিত জীব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তনের কথা ভুলে যায়। এভাবেই লক্ষ্যহীন হয়ে জীবকুল বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বা ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে, যাকে চর্বিত খাদ্য পুনরায় চর্বনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবুও ভগবান এতই কৃপাসিন্ধু যে, তিনি আত্মবিস্মৃত জীবকুলের কর্মের বিরোধিতা না করে তাকে

স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন। যদি জীব নরকে যেতে চায়, ভগবান তাতে বাধা দেন না, আবার যদি ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, তা হলে তাকে সেই কাজে সহায়তা করেন।

ভগবানকে এখানে *পরিভূঃ* বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় বা তাঁর চেয়ে শ্রেয় নয়। অন্যান্য জীব এখানে ভিক্ষার্থীরূপেই বর্ণিত হয়েছে, যারা কেবল পরমেশ্বরের কাছে বিভিন্ন সামগ্রী প্রার্থনা করে। ভগবান জীবদের বাঞ্ছিত সামগ্রী সরবরাহ করেন। জীব যদি শক্তিতে ভগবানের মতো সমকক্ষ হত, অথবা তারা যদি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হত, তা হলে ভগবানের কাছ থেকে তাদের ভিক্ষা করার কোনও প্রশ্নই থাকত না এমন কি তথাকথিত মুক্তি ভিক্ষা করা পর্যন্ত। যথার্থ মুক্তি তখনই লাভ হয়, যখন সে ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তন করে। নির্বিশেষবাদীদের ধারণায় মুক্তি হচ্ছে কাল্পনিক বা মিথ্যা। যতক্ষণ না ভিক্ষার্থী তাঁর চিন্ময় চেতনা ফিরে পায় এবং তার স্বরূপের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ভগবানের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি নিত্য চলতে থাকবে।

কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঁচ হাজার বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি দিব্যলীলার মাধ্যমে তাঁর ভগবত্তার পূর্ণ প্রকাশ প্রদর্শন করেন। বাল্যলীলায় তিনি বহু দৈত্য-দানব সংহার করেন। সে সমস্ত লীলা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে হয়নি। সাধারণ জীবের মতো ভারোত্তোলন অনুশীলন না করেই, তিনি বিশাল গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেন। সামাজিক বিধি ও কলঙ্ক গ্রাহ্য না করেই তিনি গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করেন। যদিও প্রণয়ঘটিত ভালবাসা নিয়ে গোপীরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলেও, গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর লীলাবিলাসকে এমন কি কঠোর নিয়মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত পরম পূজনীয় জ্ঞান করেছেন। *শ্রীঈশোপনিষদেও*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *শুদ্ধম্* এবং *অপাপবিদ্ধম্*, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও কলুষতাহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ এই অর্থে যে, কেবলমাত্র তাঁর সংস্পর্শে এমন কি অপবিত্র জিনিস পবিত্র হয়ে যায়। এখানে *অপাপবিদ্ধম্* শব্দটি ভগবানের সান্নিধ্যের শক্তিকে উল্লেখ করে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০-৩১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে ভক্তকে আপাতদৃষ্টিতে সুদুরাচার, অর্থাৎ দুরাচারী মনে হলেও, যথার্থ জীবনপথ অবলম্বন করায় তাকে পবিত্র বলেই গ্রহণ করতে হবে। ভগবানের অপাপবিদ্ধ সঙ্গের প্রভাব এই রকম। ভগবানও *অপাপবিদ্ধম্*, কারণ কোন পাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন কাজ পাপকর্ম বলে মনে হলেও যেহেতু পাপ দ্বারা কখনও তিনি প্রভাবিত হন না, তাই তাঁর সকল কর্মই পবিত্র। যেহেতু সকল অবস্থাতেই তিনি *শুদ্ধম্* অর্থাৎ অত্যন্ত পবিত্র, তাই তিনি প্রায়ই সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অপবিত্র বা অশুচি স্থান থেকে সূর্য বাষ্প গ্রহণ করলেও স্বয়ং পবিত্র থাকে। বস্তুত, আপন পরিশুদ্ধিকরণ শক্তির দ্বারা সূর্য জঘন্যতম বস্তুকেও বিশুদ্ধ করে। সামান্য একটি জড় বস্তু সূর্য যদি এত শক্তিশালী হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবানের শক্তি এবং পবিত্রীকরণের ক্ষমতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

মন্ত্র নয়

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্ধম্—গভীর অজ্ঞানতা; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করে; **যে**—যারা; **অবিদ্যাম্**—অবিদ্যা; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **ততঃ**—তা অপেক্ষা; **ভূয়ঃ**—আরও; **ইব**—সদৃশ; **তে**—তারা; **তমঃ**—অন্ধকার; **যে**—যারা; **উ**—ও; **বিদ্যায়াম্**—বিদ্যা অনুশীলনে; **রতাঃ**—রত।

অনুবাদ

যারা অবিদ্যা অনুশীলন করে, তারা অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করে। যারা তথাকথিত বিদ্যা অনুশীলনে রত, তারা আরও ঘোরতর অন্ধকারময় স্থানে গতি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যা প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অবিদ্যার বা অজ্ঞানতা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক, তবে বিপথচালিত বা ভ্রান্ত বিদ্যা তদপেক্ষা আরও ভয়ংকর। *শ্রীঈশোপনিষদের* এই মন্ত্রটি অতীতের যে কোন সময়ের থেকে বর্তমান যুগে আরও অনেক বেশি প্রযোজ্য। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সভ্যতা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে পারমার্থিক বিষয়। সেখান থেকে বিমুখ হয়ে জড়-জাগতিক উন্নতিতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায়, মানুষ পূর্বাপেক্ষা দিন দিন আরও অসুখী হয়ে পড়ছে।

প্রথম মন্ত্রেই 'বিদ্যা' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভগবানই সমস্ত কিছুর মালিক। এই প্রকৃত ঘটনার বিস্মৃতিকেই অজ্ঞতা বলে।

জীবনের এই সত্য ঘটনা মানুষ যত বেশি বিস্মৃত হয়, ততই সে অন্ধকারে বিরাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষ জড়-জাগতিক প্রগতিতে অনুন্নত, তার চেয়েও ভগবৎ-বিহীন তথাকথিত উন্নত শিক্ষার সভ্যতা অধিকতর বিপজ্জনক।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে—কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগী। যারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপে নিয়োজিত তাদের 'কর্মী' বলা হয়। আধুনিক সভ্যতার প্রায় শতকরা ৯৯ জন মানুষ শিল্পযোজনাবাদ, অর্থনৈতিক উন্নতি, পরার্থবাদ, রাজনৈতিক কর্মবাদ ইত্যাদি পতাকার তলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপে নিয়োজিত। তবুও ভগবৎ চেতনাহীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই কম-বেশি এই সব কার্যকলাপের ভিত্তি, যা প্রথম মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবদ্গীতার (৭/১৫) ভাষায় যারা ঘোর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে রত, তারা মূঢ়—গর্দভ। গর্দভ হচ্ছে মূঢ়তার লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ছাড়া যাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্যই নেই, *শ্রীঈশোপনিষদে* তাদের অবিদ্যার উপাসক বলে অভিহিত করা হয়েছে। শিক্ষার অগ্রগতির নামে যারা এই ধরনের সভ্যতার সহায়তা করছে তারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থকামীদের থেকে অনেক বেশি সর্বনাশ করছে। কেউটে সাপের মাথার ওপর বহুমূল্য মণির মতোই নিরীশ্বরবাদী শিক্ষার প্রগতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহুমূল্য মণি শোভিত বিষধর কেউটে সাপ মণিহীন সাপ অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক। *হরিভক্তি-সুধোদয়* অনুসারে ভগবদ্ভক্তিহীন নিরীশ্বরবাদী শিক্ষার প্রগতি, মৃতদেহের সাজসজ্জা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতেও কিছু লোক শোকাকুল আত্মীয়ের সান্ত্বনা বা প্রীতির জন্য শোভাযাত্রা সহকারে মৃতদেহ নিয়ে যায়। একইভাবে, বর্তমান সভ্যতাও পার্থিব দুঃখদুর্দশা সমূহকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে নানান ক্রিয়াকৌশলের একটি জোড়াতালি। এই সমস্ত কাজের একমাত্র লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ।

কিন্তু ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেয়, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেয় এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেয়। তাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আত্মা-উপলব্ধি বা আত্মার পারমার্থিক মূল্যবোধের উপলব্ধি। তা না হলে সেই শিক্ষা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বলেই বিবেচিত হবে। এই প্রকার অবিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ নীচের দিকে অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে পতিত হয়।

বেদ অনুসারে ভ্রান্ত জাগতিক শিক্ষকদের বলা হয়েছে ঃ (১) *বেদবাদরত,* (২) *মায়য়াপহৃতজ্ঞান,* (৩) *আসুরং ভাবমাশ্রিত* এবং (৪) *নরাধম।* *বেদবাদরত* ব্যক্তিগণ মনে করে যে, তারা বৈদিক সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বৈদিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে তারা সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৮-২৭) বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানাই বৈদিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু এই *বেদবাদরত* ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর শ্রীভগবান সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, তারা স্বর্গ প্রাপ্তির মতো সৎকর্ম ফলশ্রুতির প্রতি অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন।

প্রথম মন্ত্র অনুসারে আমাদের জানা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুর মালিক এবং আমাদের জন্য বরাদ্দ জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় অংশটুকু কেবল গ্রহণ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিস্মৃতিশীল জীবদের মধ্যে এই ভগবৎ চেতনা জাগ্রত করাই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং মূর্খ মানব জাতিকে ভগবৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেই একই উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন শাস্ত্রে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এভাবেই ব্যক্তিসকলকে ভগবৎ-সন্নিধানে ফিরিয়ে আনাই বিশ্বের সমস্ত ধর্মের অন্তিম উদ্দেশ্য।

কিন্তু *বেদের* অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধির পরিবর্তে *বেদবাদরত* ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য স্বর্গসুখের মতো আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে

মুখ্যত স্বীকার করে নেয় এবং কামবাসনা যা জীবের জড়-জাগতিক বন্ধনের মূল কারণ—তাকে বেদের অন্তিম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এইপ্রকার ব্যক্তিগণ বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের অপব্যাখ্যা করে অন্য সকলকে বিপথে চালিত করে। কখনও কখনও তারা এমন কি সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রামাণিক বৈদিক বিশ্লেষণ সমন্বিত *পুরাণগুলিকে* নিন্দা ও অগ্রাহ্য করে। মহান আচার্যদের প্রামাণিক গ্রন্থকে উপেক্ষা করে *বেদবাদরত* ব্যক্তিরা নিজেরাই *বেদের* ভাষ্য রচনা করে। তারাই আবার তাদের মধ্যে থেকে বিবেক বর্জিত কয়েকজন ব্যক্তিকে বৈদিক শিক্ষার প্রধান প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠা করে। এই মন্ত্রে সঙ্গতভাবেই যথার্থ প্রতিপাদক সংস্কৃত *বিদ্যারত* শব্দের দ্বারা এই সব ব্যক্তিদের বিশেষভাবে নিন্দা করা হয়েছে। *বিদ্যা* অর্থ *বেদ,* কারণ *বেদই* সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস এবং রত অর্থ নিয়োজিত। এভাবেই *বিদ্যারত* শব্দটির অর্থ '*বেদ* অধ্যয়নে নিয়োজিত।' তথাকথিত *বিদ্যারত* ব্যক্তিকে এই মন্ত্রে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ আচার্যদের প্রতি তাদের অবজ্ঞার জন্য তারা *বেদের* অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানে না। এই সব *বেদবাদরত* ব্যক্তিগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য *বেদের* প্রতিটি শব্দের অর্থ খুঁজে বের করতে অভ্যস্ত। তারা জানেনা যে, এই বৈদিক সাহিত্য কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থের সংকলন নয় এবং গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারার মাধ্যম ছাড়া সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

বেদের দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। সেটিই *কঠ উপনিষদের* নির্দেশ। কিন্তু এই *বেদবাদরত* ব্যক্তিদের নিজস্ব আচার্য রয়েছে, যে অপ্রাকৃত পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত নয়। এভাবেই বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের অপব্যাখ্যা করে তারা অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকার প্রদেশেই কেবল অগ্রসর হয়। এমন কি তারা বৈদিক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিপতিত হয়।

মায়য়াপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ নিজেরাই হচ্ছে 'ভগবান' সুতরাং অন্য কোন ভগবানের উপাসনার প্রয়োজন নেই। তারা একজন সাধারণ মানুষকেও পূজা করতে প্রস্তুত যদি সে ধনী হয়, কিন্তু তারা পরমেশ্বর ভগবানকে কখনও উপাসনা করে না। এই সব নির্বোধগণের কখনও এই উপলব্ধি হয় না যে, ভগবানের পক্ষে মায়া কবলিত হওয়া অসম্ভব। ভগবান যদি মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন, তা হলে মায়া ভগবান থেকেও অধিক ক্ষমতাশালী প্রতিপন্ন হবে। এই প্রকার মানুষেরা বলে যে, ভগবান সর্বশক্তিমান, কিন্তু তারা বিবেচনা করে না যে, যদি তিনি সর্বশক্তিমান হন, তা হলে তাঁর মায়ার বশীভূত হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। এই সব মনগড়া ভগবানেরা পরিষ্কারভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না; তারা শুধু নিজেরা ভগবান সেজেই তৃপ্তি অনুভব করে।

মন্ত্র দশ

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

অন্যৎ—ভিন্ন; এব—অবশ্যই; আহুঃ—বলেছেন; বিদ্যয়া—বিদ্যা অনুশীলন দ্বারা; অন্যৎ—ভিন্ন; আহুঃ—বলেছেন; অবিদ্যয়া—অবিদ্যা অনুশীলন দ্বারা; ইতি—এই প্রকারে; শুশ্রুম—আমি শুনেছি; ধীরাণাম্—ধীর ব্যক্তি থেকে; যে—যাঁরা; নঃ—আমাদিগকে; তৎ—তা; বিচচক্ষিরে—বিশ্লেষণ করেছেন।

অনুবাদ

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন যে, বিদ্যা অনুশীলন থেকে এক ফল লাভ হয় এবং অবিদ্যা অনুশীলন থেকে ভিন্ন ফল লাভ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (১৩/৮-১২) শিক্ষা অনুসারে বিদ্যা অনুশীলন কর্তব্য নিম্নলিখিতভাবে—

১) নিজেকে প্রথমেই খাঁটি ভদ্রলোক হতে হবে এবং অন্যদের উপযুক্ত সম্মান করতে শিখতে হবে।

২) কেবলমাত্র নাম ও যশের জন্য কারও কখনই নিজেকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

৩) কায়, মন অথবা বাক্য দ্বারা কখনই অন্যের উদ্বেগের কারণ হওয়া কারও উচিত নয়।

৪) এমন কি অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হলেও ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা লাভ করা উচিত।

৫) অন্যের সাথে ব্যবহারে কারও কখনই কপটতা বা ছলনার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

৬) সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করা উচিত, যিনি তাকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উপনীত হতে সাহায্য করতে পারেন এবং এই প্রকার আচার্যের নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করে তাঁর সেবা করা এবং পরিপ্রশ্ন করা উচিত।

৭) আত্ম-উপলব্ধির স্তর লাভের জন্য শাস্ত্রানুমোদিত বিধি-নিষেধগুলি অবশ্যই পালন করা উচিত।

৮) অবশ্যই শাস্ত্র সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

৯) আত্ম-উপলব্ধির পথে ক্ষতিকর সব রকম অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা উচিত।

১০) দেহের প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

১১) স্থূল জড় দেহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নরূপে গণ্য করা উচিত নয় এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যারা তাদের নিজের বলে বিবেচনা করা উচিত নয়।

১২) সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ জড় দেহ থাকবে ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির সম্মুখীন হতেই হবে। এই জড় দেহের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভের জন্য পরিকল্পনা করার কোনও অর্থই হয় না। চিন্ময় স্বরূপ পুনরুদ্ধারের উপায় অন্বেষণই একমাত্র উত্তম পরিকল্পনা।

১৩) পারমার্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

১৪) শাস্ত্রের নির্দেশনা ভিন্ন স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে অধিক আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

১৫) চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বা না হলে আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়।

১৬) অনন্য ভক্তিদ্বারা কায়-মন-বাক্যে ঐকান্তিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া উচিত এবং ঐকান্তিক মনোযোগ সহকারে সেবা করা উচিত।

১৭) পারমার্থিক সাধনার পক্ষে অনুকূল শান্ত পরিবেশে নির্জন স্থানে বসবাসের জন্যই কামনা করা উচিত এবং অভক্তের ভিড়ে পরিপূর্ণ জনসমাকীর্ণস্থান পরিহার করা কর্তব্য।

১৮) পরা বিদ্যা নিত্য, কিন্তু জড় দেহের অবসানের সাথে সাথেই অপরা বিদ্যা বিনাশ হয়। এই সত্য উপলব্ধি করে পরা বিদ্যা গবেষণা করার জন্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হওয়া উচিত।

এই আঠারোটি নিয়মই প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের ক্রমিক সোপান বা পথ। কিন্তু এগুলি ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিগুলি অবিদ্যার নামান্তর। মহান আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে সব রকম জড়বিদ্যা কেবল মায়ার বৈভব এবং তা অনুশীলন করে কেউ গাধা অপেক্ষা উন্নত হতে পারে না। *ঈশোপনিষদে* সেই একই নৈতিক শিক্ষা দেখা যায়। জড় বিদ্যার উন্নতির মাধ্যমে আধুনিক কালের মানুষ প্রকৃতপক্ষে একটি গাধায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কোনও কোনও জড়বাদী রাজনীতিবিদ পারমার্থিক ভান করে বর্তমান সভ্যতার প্রক্রিয়াকে শয়তান বলে নিন্দা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত বিদ্যা অনুশীলনে যত্নবান হয় না। এভাবেই তারা শয়তানের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে না।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, এমন কি একটি সামান্য বালক পর্যন্ত নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কুশিক্ষা প্রদানের ফলে সারা বিশ্বের ছাত্র-সমাজ আজ প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট উদ্বেগের কারণ হয়েছে।

শ্রীঈশোপনিষদ তাই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে যে, প্রকৃত বিদ্যা অনুশীলন থেকে অবিদ্যার অনুশীলন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান জগতের তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবিদ্যার কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; ফলস্বরূপ বৈজ্ঞানিকেরা অন্য দেশগুলির অস্তিত্ব ধ্বংস করার ক্ষমতাসম্পন্ন মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আজ আর ব্রহ্মচর্য কিংবা পারমার্থিক জীবনের নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রতি তাদের আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। বাস্তব জীবনে ধর্মনীতি পালনের পরিবর্তে কেবল নাম ও যশের জন্যই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। এভাবেই শুধু মাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে শত্রুতাচরণ তা নয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বৈরিতা বর্তমান।

সাধারণ মানুষের অবিদ্যার অনুশীলনের ফলেই আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উগ্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি হয়েছে। কেউ এই কথা ভাবছে না যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি একটি বস্তুপিণ্ড মাত্র এবং অন্যান্য বস্তু-পিণ্ডের সাথে অনন্ত মহাকাশে ভাসছে। মহাশূন্যের বিশালত্বের তুলনায় এইসব ভাসমান বস্তুপিণ্ডগুলিকে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণার মতো মনে হয়। যেহেতু ভগবান করুণা করে এই সমস্ত জড় পিণ্ডগুলিকে সম্পূর্ণ করেছেন, তাই এগুলি মহাশূন্যে ভেসে থাকার মতো প্রয়োজনীয় সব রকম উপাদানের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সুসজ্জিত। আমাদের মহাকাশযান চালকেরা তাদের কৃতিত্বের জন্য খুবই গর্বিত, কিন্তু মহাকাশযান অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি বিশালাকার গ্রহগুলির পরম চালকের কথা তারা মোটেই ভাবে না।

মহাশূন্যে অসংখ্য সূর্য এবং অসংখ্য গ্রহমণ্ডল বর্তমান রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশরূপে ক্ষুদ্র হয়ে আমরা এই অসীম গ্রহমণ্ডলের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছি। এভাবেই আমরা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করি এবং বিশেষত বার্ধক্য ও ব্যাধির

প্রকোপে হতাশ হয়ে পড়ি। মানুষের জীবনকাল প্রায় একশ বছরের জন্য নির্ধারিত হলেও তা ক্রমশ বিশ-ত্রিশ বছরে হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমানের অবিদ্যা অনুশীলনকে ধন্যবাদ, যার সাহায্যে প্রতারিত মানুষেরা কিছু বছরের জন্যে হলেও অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ইন্দ্রিয় উপভোগের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এই ছোট্ট জড় জগতের মধ্যে তাদের নিজ নিজ জাতি গঠন করেছে। এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা তাদের জাতীয় সংহতির নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণতা বিধানের জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে চলেছে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাই পরিশেষে হাস্যকর হয়ে পড়ছে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশই আজ অন্য দেশের উদ্বেগের কারণ হচ্ছে। প্রতিটি দেশের জাতীয় শক্তির পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি আজ সামরিক খাতে ব্যয় হচ্ছে এবং এভাবেই বিনষ্ট হচ্ছে। কোন মানুষই আজ প্রকৃত বিদ্যা অনুশীলনের কথা ভাবছে না, তবুও পরা ও অপরা বিদ্যার ক্ষেত্রেই উন্নতি হচ্ছে বলে তারা মিথ্যা গর্ব করছে।

শ্রীঈশোপনিষদ এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করছে এবং *ভগবদ্গীতা* প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের জন্য উপদেশ দিচ্ছে। এই মন্ত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, *ধীর* ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যার নির্দেশাবলী অবশ্যই অর্জন করতে হবে। যিনি কখনও মায়ার দ্বারা বিচলিত হন না তিনিই হচ্ছেন ধীর ব্যক্তি। সম্পূর্ণ পারমার্থিক উপলব্ধি ব্যতিরেকে কারও পক্ষে *ধীর* হওয়া সম্ভব নয়। যিনি সম্পূর্ণ পারমার্থিক উপলব্ধি অর্জন করেছেন তিনি কোন কিছুর জন্যই কামনা বা শোক প্রকাশ করেন না। এই *ধীর* ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, জড় সংসর্গে আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত তার জড় দেহ এবং মন নশ্বর; তাই তিনি অনিত্য বস্তুর সদ্ব্যবহার যতদূর সম্ভব শুধু তাই করেন।

চেতন জীবাত্মার কাছে মায়িক দেহ এবং মন হচ্ছে প্রতিকূল। এই জড় জগৎ প্রাণহীন, কিন্তু চিন্ময় জগতে চেতন জীবের প্রকৃত কাজ রয়েছে। যতকাল প্রাণহীন জড় বস্তুকে জীবন্ত চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ

নিপুণভাবে ব্যবহার করে, ততকাল মৃত জগৎ জীবন্ত জগৎরূপে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে পরম জীবের অবিচ্ছেদ্য অংশ চেতন আত্মারাই এই জড় জগৎকে চালিত করে। প্রকৃত উচ্চ অধিকারীর কাছ থেকে শ্রৌত পন্থায় এই সমস্ত সত্য ঘটনা যাঁরা জানতে পারেন তাঁরাই একমাত্র ধীর। বিধি-নিষেধ অনুশীলন করে ধীররাই একমাত্র এই বিদ্যা উপলব্ধি করেন।

বিধি-নিষেধ অনুশীলনকারীকে প্রথমে অবশ্যই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অপ্রাকৃত বাণী এবং বিধি-নিষেধ সদ্‌গুরুর নিকট থেকে শিষ্যের কাছে নেমে আসে। অবিদ্যা শিক্ষার অনিশ্চিত পথে সেই জ্ঞান লভ্য নয়। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের বাণী বিনীতভাবে শ্রবণ করেই *ধীর* হওয়া যায়। আদর্শ শিষ্য হবেন ঠিক অর্জুনের মতো এবং সদ্‌গুরু হবেন স্বয়ং ভগবানের মতো। *ধীর* ব্যক্তি থেকে বিদ্যাশিক্ষা লাভের এই হচ্ছে উপায়।

যিনি *ধীর* হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত হননি, সেই *অধীর* ব্যক্তি কখনই শিক্ষাগুরু হতে পারে না। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ নিজেদের *ধীর* মনে করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে সকলেই *অধীর,* তাই তাদের কাছে কেউই পূর্ণজ্ঞান লাভের আশা করতে পারে না। তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক লাভ নিয়েই তারা কেবলমাত্র ব্যস্ত। তাই তাদের পক্ষে অধিকাংশ জনসাধারণকে আত্ম-উপলব্ধির সঠিক পথে পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব? যথার্থ বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে হলে অবশ্যই *ধীর* ব্যক্তির কাছে বিনম্রভাবে শ্রবণ করতে হবে।

মন্ত্র এগার

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

বিদ্যাম্—বিদ্যা; **চ**—এবং; **অবিদ্যাম্**—অবিদ্যা; **চ**—এবং; **যঃ**—যিনি; **তৎ**—তা; **বেদ**—জানে; **উভয়ম্**—উভয়; **সহ**—যুগপৎভাবে; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা অনুশীলন দ্বারা; **মৃত্যুম্**—পুনঃ পুনঃ মৃত্যু; **তীর্ত্বা**—অতিক্রম করে; **বিদ্যয়া**—বিদ্যা অনুশীলন দ্বারা; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **অশ্নুতে**—উপভোগ করেন।

অনুবাদ

যিনি পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই যুগপৎ শিক্ষা করেন, তিনিই একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করে অমৃতত্ব উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি থেকে প্রত্যেকেই চিরস্থায়ী জীবন লাভে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির আইন এতই নিষ্ঠুর যে, কেউই মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেতে সক্ষম হচ্ছে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, কেউই মরতে চায় না। তেমনই কেউই জরা অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না। কিন্তু প্রকৃতির আইন কাউকেই জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই দেয় না। জড় বিদ্যার অগ্রগতিও জীবনের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য জড় বিজ্ঞান আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য জড় বিজ্ঞান কোন কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।

পুরাণ থেকে আমরা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারি এবং জড়-জাগতিক দিক থেকে সে ছিল চরম উন্নত। তার অবিদ্যা জনিত জড়-জাগতিক লব্ধ বস্তু এবং শক্তির সাহায্যে মৃত্যুকে জয় করতে চেয়ে সে এমন এক ধরনের কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে যে, সমস্ত গ্রহমণ্ডলের অধিবাসীরা তার যোগশক্তির প্রভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তার কাছে উপনীত হতে বাধ্য করে। ব্রহ্মার কাছে সে অমরত্ব লাভের প্রার্থনা করে, যার ফলে তার আর মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মা তাকে বলেন যে, তিনি অমরত্ব বর দিতে পারেন না, কারণ জড় জগতের স্রষ্টা ও গ্রহমণ্ডলীর শাসনকর্তা হলেও তিনি নিজেই অমর নন। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, ব্রহ্মার জীবনকাল অতিদীর্ঘ হলেও তার অর্থ এই নয় যে, তাঁকে মরতে হবে না।

হিরণ্য মানে সোনা এবং *কশিপু* মানে কোমল শয্যা। এই ভদ্রলোক টাকা এবং নারী এই দুটি বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল এবং অমর হয়ে সে সেগুলি ভোগ করতে চেয়েছিল। তার অমর হওয়ার বাসনা পূর্ণ করার আশায় সে ব্রহ্মাকে পরোক্ষভাবে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিল। ব্রহ্মা যেহেতু তাকে বললেন যে, তিনি অমরত্ব বর দান করতে পারেন না, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, চুরাশি লক্ষ প্রজাতির মধ্যে মানব, পশু, দেবতা বা অন্য কোন জীব যেন তাকে হত্যা করতে না পারে। সে আরও অনুরোধ করেছিল যে, জলে, স্থলে এবং আকাশে কিংবা কোনও অস্ত্র দ্বারাই সে যেন নিহত না হয়। এভাবেই হিরণ্যকশিপু নির্বোধের মতো মনে করেছিল যে, এই প্রতিশ্রুতিগুলি তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। শেষ পর্যন্ত, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার এই সমস্ত বর লাভ করেও অর্ধনর এবং অর্ধসিংহরূপী ভগবান নৃসিংহদেবের দ্বারা নিহত হয় এবং তাকে বধ করতে ভগবান নখ ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রই ব্যবহার করেননি। জল, স্থল বা আকাশের

কোথাও সে নিহত হয়নি, কেন না সে নিহত হয় এমন এক আশ্চর্যজনক জীবের কোলে যার সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এই যে, জড় বৈভবে চরম উন্নত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হিরণ্যকশিপুও তার বিভিন্ন প্রকল্প সত্ত্বেও মৃত্যুকে জয় করতে পারেনি। তা হলে যাদের পরিকল্পনা প্রতি মুহূর্তেই ব্যর্থ হচ্ছে, সেই আজকালকার ক্ষুদ্র হিরণ্যকশিপুদের ক্ষমতা কতটুকু?

জীবনসংগ্রামে জয় লাভের জন্য একমুখীন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই *শ্রীঈশোপনিষদ* আমাদের দিচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকেই কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির নিয়ম এমন কঠোর যে, কেউই তাদের অতিক্রম করতে পারে না। চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে হলে আমাদের ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে।

যে পদ্ধতি দ্বারা ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তন করা যায়, তা ভিন্ন শাখার জ্ঞান এবং *উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্র থেকেই কেবল এই জ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে হবে। এই জীবনে সুখ পেতে হলে এবং এই জড়-জাগতিক দেহের অবসানে চিরন্তন ও আনন্দময় জীবন লাভ করতে হলে, এই সব পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ গ্রহণ করে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হবে। সংসারবদ্ধ জীব ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে অস্থায়ী জন্মভূমিকেই সে ভ্রমবশত সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছে। ভগবান কৃপাবশত উপরোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে প্রদান করেছেন বিস্মরণশীল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, তার আলয় এখানে এই জড় জগতে নয়। জীব মাত্রই চিন্ময় সত্তাবিশিষ্ট এবং তার চিন্ময় আলয়ে প্রত্যাগমন করেই কেবল সে সুখী হতে পারে।

এই শাশ্বত বাণী প্রচারের জন্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ধাম থেকে তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের এই জড় জগতে প্রেরণ করেন, যাতে জীবসকল

ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে এবং এই কার্য করার জন্য কখনও কখনও ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন। সকল জীবই যেহেতু তাঁর প্রিয় সন্তান, তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই এই জড়-জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় আমরা যে অনবরত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি তা দেখে ভগবান আমাদের চেয়েও অনেক বেশি ব্যথিত হন। এই জড় জগতের দুঃখভোগ পরোক্ষভাবে জড় বস্তুর সঙ্গে একত্রে থাকতে বা কাজ করতে আমরা যে অক্ষম তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের সেবা সম্পাদন করছে। সাধারণত বুদ্ধিমান জীবেরা সমস্ত অনুস্মারকদের বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং *বিদ্যা* বা অপ্রাকৃত জ্ঞান অনুশীলনে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এই *পরা বিদ্যা* বা অপ্রাকৃত জ্ঞান অনুশীলনের জন্য মানব জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ এবং যেই মানুষ এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না সে *নরাধম*।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য *অবিদ্যার* পথ বা জড় বিদ্যার অগ্রগতি হচ্ছে বার বার জন্ম-মৃত্যুর পথ। যেই মাত্র সে চিন্ময় স্তরে অবস্থান করে তখন জীবের আর জন্ম-মৃত্যু হয় না। চিন্ময় আত্মার বাহ্যিক আবরণ জড়দেহের ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু প্রযোজ্য। বাহ্যিক পোশাক খুলে ফেলার সঙ্গে মৃত্যুর এবং পরিধানের সঙ্গে জন্মের তুলনা করা যেতে পারে। অবিদ্যা অনুশীলনে স্থূলভাবে আবিষ্ট মূর্খ মানুষেরা এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়াকে কিছুই মনে করে না। মায়াশক্তির সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়ে, তারা বার বার একই জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রকৃতির আইন থেকে কোন শিক্ষাই অর্জন করে না।

বিদ্যার অনুশীলন বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করা মানব-জীবনের একান্ত প্রয়োজন। ভবরোগাক্রান্ত মায়াবদ্ধ জীবের অবাধ ইন্দ্রিয় উপভোগ প্রবৃত্তিকে যতদূর সম্ভব সংযত করতে হবে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে অবাধ ইন্দ্রিয় ভোগাসক্ত জীবন জীবকে অজ্ঞান ও মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। জীবেরা চিন্ময় ইন্দ্রিয়-বিহীন নয়; আদি, চিন্ময় স্বরূপে

প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, যেগুলি দেহ ও মন দ্বারা আবৃত হয়ে এখন জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। জড় ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপ তার চিন্ময় লীলাবিলাসের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। ভবরোগাক্রান্ত অবস্থায় চিন্ময় আত্মা জড় আবরণে আবৃত হয়ে জড় কর্মে নিযুক্ত হয়। প্রকৃত ইন্দ্রিয় উপভোগ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন জড়বাদের ব্যাধি দূরীভূত হয়। সমস্ত জড় কলুষমুক্ত হয়ে প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে অবস্থিত হলেই কেবল শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিকৃত জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ নয়; ভবরোগ নিরাময়ের জন্যে আগ্রহী হতে হবে। ভবরোগ বৃদ্ধি কোন অর্থেই প্রকৃত বিদ্যার লক্ষণ নয়, বরং *অবিদ্যা* বা অজ্ঞানতার লক্ষণ। সুস্বাস্থ্যের জন্য জ্বরের মাত্রা ১০৫ ডিগ্রী থেকে ১০৭ ডিগ্রীতে বাড়ানো উচিত নয়, বরং তাকে স্বাভাবিক ৯৮.৬-ডিগ্রীতে নামিয়ে আনা উচিত। সেটিই মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার প্রবণতা হচ্ছে জ্বরগ্রস্ত জড়-জাগতিক অবস্থার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা, যা আজ আণবিক শক্তিরূপে ১০৭ডিগ্রী তাপমাত্রাতে পৌঁছেছে। ইত্যবসরে মূর্খ, নির্বোধ রাজনীতিবিদরা তারস্বরে ঘোষণা করছে, যে-কোন মুহূর্তেই এই জগতের সর্বনাশ হতে পারে। সেটিই হচ্ছে জড় বিদ্যার অগ্রগতি এবং মানব-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরা বিদ্যা অনুশীলনে অবহেলার পরিণতি। *শ্রীঈশোপনিষদ* এখানে সতর্ক করছে যে, এই মৃত্যুমুখী ভয়াবহ পথ আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, পরা বিদ্যার অনুশীলনে আমাদের অবশ্যই উন্নতি সাধন করা উচিত যাতে মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারি।

এর অর্থ এই নয় যে, দেহের প্রতিপালনের জন্য সমস্ত কাজ বন্ধ করতে হবে। কাজ বন্ধ করার আদৌ কোন প্রশ্ন ওঠে না, ঠিক যেমন রোগমুক্তির জন্য শরীরের তাপ একেবারেই মুছে ফেলার প্রয়োজন হয়

না। "প্রতিকূল অবস্থাতেও প্রফুল্লচিত্ত হতে চেষ্টা করা" হচ্ছে যথোচিত অভিব্যক্তি। পরা বিদ্যার অনুশীলনে দেহ ও মনের সহায়তা অপরিহার্য; সুতরাং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে দেহ ও মনের প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজন। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রী রাখা উচিত এবং ভারতের মুনি-ঋষিগণ জড়া ও পরা বিদ্যার ভারসাম্য কর্মসূচীর দ্বারা স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছেন। রোগগ্রস্ত ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য মনুষ্যবুদ্ধির অপব্যবহার করাকে তারা কখনও সমর্থন করেননি।

ইন্দ্রিয়তর্পণ অভিমুখী প্রবণতার দ্বারা রোগগ্রস্ত মানুষের কার্যকলাপ মুক্তির মূলতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে *বেদে* নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে নিয়োজিত থাকে, কিন্তু আজকাল কেউই ধর্ম বিষয়ে বা মুক্তিলাভে আগ্রহী নয়। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা নানা রকম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে চলেছে। বিপথগামী মানুষেরা মনে করে যে, ধর্মানুষ্ঠান করা উচিত কারণ তা অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন। এভাবেই মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে আরও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ সুনিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু এটিই মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি শুধু দেহের সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। একমাত্র পরা বিদ্যা উপলব্ধির জন্য সুস্থ মনসহ স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করা উচিত, যা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। গাধার মতো পরিশ্রম করা অথবা ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অবিদ্যার অনুশীলন করা এই জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

পরাবিদ্যার পন্থা *শ্রীমদ্ভাগবতে* সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা মানুষকে পরমতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য তার জীবনকে নিয়োগ

করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমতত্ত্বকে ক্রমশ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং অবশেষে ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। মন্ত্র দশের তাৎপর্যে বর্ণিত *ভগবদ্গীতা* প্রদত্ত আঠারোটি নীতি পালন করে জ্ঞান ও বৈরাগ্য যিনি লাভ করেছেন এমন বদান্য, উদার হৃদয় ব্যক্তিই পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই আঠারোটি নিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রয়োগ শিক্ষা লাভের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিশ্চিত পন্থা শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যা আমরা Nectar of devotion গ্রন্থে ইংরেজীতে পরিবেশন করেছি। নীচে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোকের মাধ্যমে সংক্ষেপে পরা বিদ্যার অনুশীলন ব্যক্ত করা হয়েছে—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥

"অতএব ভক্তদের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা ভক্তমাত্রই সর্বদা কর্তব্য।"

(*ভাঃ* ১/২/১৪)

ধর্ম, অর্থ ও কাম যদি ভগবদ্ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, তা হলে সেগুলি অবিদ্যার বিভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নয়, যা *শ্রীঈশোপনিষদের* পরবর্তী মন্ত্রে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এই যুগে পরাবিদ্যা অনুশীলনের জন্য অবশ্যই পরমার্থবাদীদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরন্তর শ্রবণ করা, কীর্তন করা এবং আরাধনা করা একান্ত কর্তব্য।

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্ধম্—অজ্ঞানতা; তমঃ—অন্ধকার; প্রবিশ্যন্তি—প্রবেশ করে; যে—যারা; অসম্ভূতিম্—দেবতাদের; উপাসতে—উপাসনা করে; ততঃ—তা অপেক্ষা; ভূয়ঃ—আরও অধিক; ইব—সেই রকম; তে—তারা; তমঃ—অন্ধকার; যে—যারা; উ—ও; সম্ভূত্যাম্—ব্রহ্মে; রতাঃ—নিযুক্ত।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংস্কৃত *অসম্ভূতি* শব্দটিতে যাদের কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। *সম্ভূতি* শব্দে পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥

"দেবতা বা মহর্ষিরা আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।" (ভঃ *গীঃ* ১০/২) সমস্ত দেবতা, মহর্ষি এবং যোগীদের প্রতি অর্পিত সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যদিও তারা বিশাল ক্ষমতার

দ্বারা ভূষিত, তবুও কিভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন, তা জানা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

দার্শনিক, মহর্ষি অথবা যোগীরা তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষমতার সাহায্যে পরমতত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা পরমতত্ত্বের সদর্থক উপলব্ধির পরিবর্তে আপেক্ষিক তত্ত্বের অসদর্থক বিষয় উপলব্ধি করতেই কেবল সাহায্য করে। *নেতি নেতি* পন্থায় পরমতত্ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ সম্পূর্ণ নয়। এইরূপ অসদর্থক সংজ্ঞা কারও কল্পিত মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করতেই মাত্র সাহায্য করে; এভাবেই তিনি মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব অবশ্যই নিরাকার এবং নির্গুণ। সদর্থক গুণাবলীর বিপরীতটাই হচ্ছে অসদর্থক গুণাবলী এবং তা আপেক্ষিক। এভাবেই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা বড় জোর ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে পৌঁছানো যেতে পারে, কিন্তু তার থেকে দূরবর্তী পরম পুরুষ ভগবানের কাছে সে অগ্রসর হতে পারে না।

এই প্রকার মনোধর্মী-প্রসূত জল্পনাকারীরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত জ্যোতি এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর সর্বব্যাপী রূপ। তারা এও জানে না যে, নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানের অপ্রাকৃত গুণসহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যরূপে বিরাজিত। অধঃস্তন দেবতারা ও মহর্ষিরা তাঁকে ত্রুটিপূর্ণভাবে একজন ক্ষমতাশালী দেবতারূপে মনে করেন এবং ব্রহ্মজ্যোতিকেই পরম তত্ত্ব বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু অনন্য ভজনশীল কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তগণ জানতে পারেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভব হয়। এইপ্রকার ভক্তরা নিরন্তর প্রীতি সহকারে সব কিছুর উৎস শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) আরও বলা হয়েছে যে, হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য প্রবল কামনার দ্বারা চালিত হয়ে ক্ষণস্থায়ী সমস্যা

সমাধানের জন্য দেবতাদের উপাসনা করে। কোনও কোনও দেবতাদের কৃপার দ্বারা বিশেষ কোনও অসুবিধা থেকে অস্থায়ী উপশমের যে সমাধান, তা কেবল বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই অনুসন্ধান করে থাকে। জীবাত্মা যেহেতু জড় জগতে আবদ্ধ, তাই চিন্ময় স্তরে যেখানে নিত্য আনন্দ, জ্ঞান বর্তমান, সেই চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতার উপাসকেরা দেবলোকে যেতে পারে। এভাবেই চন্দ্র উপাসকেরা চন্দ্রলোকে, সূর্য উপাসকেরা সূর্যলোকে গমন করতে পারে, ইত্যাদি। বর্তমান বিজ্ঞানীরা মহাকাশ যানের সাহায্যে চন্দ্র অভিযানের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোন নতুন প্রচেষ্টা নয়। মহাকাশযান, যৌগিক সিদ্ধি বা দেবতাদের উপাসনা দ্বারা উন্নত চেতনা-সম্পন্ন মানুষেরা মহাকাশ অভিযানে অন্যান্য গ্রহলোকে প্রবেশ করতে উৎসুক। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই তিনটির যে কোন একটি উপায়ে অন্যান্য গ্রহলোকে পৌঁছানো যেতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে সহজলভ্য পন্থা হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট গ্রহলোকের অধিষ্ঠাতৃ বিশেষ দেবতার উপাসনা করা। যাই হোক না কেন, এই জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত গ্রহলোকগুলি হচ্ছে অস্থায়ী বাসগৃহ; একমাত্র বৈকুণ্ঠলোকগুলি হচ্ছে স্থায়ী গ্রহলোক। এগুলিকে চিদাকাশেই দেখা যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সেগুলির কর্তৃত্ব করেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"এই জড় জগতে সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে সর্বনিম্ন গ্রহলোক পর্যন্ত সর্বত্রই যন্ত্রণার স্থান যেখানে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, যে আমার ধামে উন্নীত হয়, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।" (ভঃ গীঃ ৮/১৬)

শ্রীঈশোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন না কোন উপায়ে বিভিন্ন গ্রহে ইতস্তত ভ্রমণের মাধ্যমে জীব ব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে। একটি নারকেল যেমন খোসার দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিও বিশাল জড় উপাদানগুলির দ্বারা আবৃত থাকে। এই জড় আবরণ নিশ্ছিদ্র হওয়ার ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডটি গভীর অন্ধকারময়, তাই সেটিকে আলোকিত করতে সূর্য ও চন্দ্রের প্রয়োজন। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ওপারে ব্রহ্মজ্যোতি বিরাজমান এবং বৈকুণ্ঠলোকসমূহ এই ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থিত সর্বোচ্চ গোলোক বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলোক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল। ভগবান কখনও এই কৃষ্ণলোক ত্যাগ করেন না। যদিও তাঁর নিত্যপার্ষদ সহ তিনি সেখানে বসবাস করলেও, পূর্ণ মায়িক জগৎ এবং চিন্ময় জগতের সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। এই কথা *ঈশোপনিষদের* চতুর্থ মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঠিক সূর্যের মতো ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তবুও সূর্য যেমন বিপথে চালিত না হয়ে তার নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থিত, তেমনই তিনিও একই স্থানে অবস্থিত।

কেবলমাত্র চন্দ্রে অভিযান দ্বারা জীবনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আজকাল অনেক কপট উপাসক আছে যারা নাম এবং যশ লাভের জন্য ধার্মিক হয়। এই সব কপট ধার্মিক ব্যক্তিরা মায়িক জগৎ ত্যাগ করে চিদাকাশে উপনীত হতে প্রয়াস করে না। তারা ভগবৎ উপাসনার ছলে এই জড় জগতে নিজেদের পদমর্যাদা রক্ষা করতে চায় মাত্র। নাস্তিক ও নির্বিশেষবাদীরা এইসব মূঢ়, কপট ধার্মিকদেরকে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে গভীর অন্ধকারময় লোকে পরিচালিত করে। নাস্তিকেরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নির্বিশেষবাদীরা নাস্তিকদের সমর্থন করে। এভাবেই এই

পর্যন্ত আমরা *শ্রীঈশোপনিষদের* কোন মন্ত্রের সম্মুখীন হইনি যেখানে পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয় যে, তিনি সকলের চেয়ে দ্রুতগামী। যারা অন্যান্য গ্রহলোকের দিকে গমন করছে তারা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যক্তি এবংভগবান যদি তাদের সকলের চেয়ে দ্রুত গমনাগমন করতে পারেন, তখন নিরাকার নির্বিশেষ রূপে কিভাবে তিনি বিবেচিত হতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ ধারণা হচ্ছে পরমতত্ত্বের অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে উত্থিত অজ্ঞানতার আর একটি রূপ।

তাই যারা সরাসরিভাবে বৈদিক শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে, সেই অজ্ঞ, কপট ধার্মিকেরা এবং তথাকথিত অবতার সৃষ্টিকারীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম অন্ধকার লোকে প্রবেশ করতে বাধ্য, কারণ তারা তাদের অনুগামীদের বিপথে চালিত করে। এই সব নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত বৈদিক জ্ঞানহীন নির্বোধদের কাছে নিজেদের ভগবানের অবতাররূপে ভান করে। এই সব নির্বোধদের আদৌ কোন জ্ঞান থাকলেও, তা অজ্ঞান অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। এই সব নির্বিশেষবাদীরা এমন কি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দেবতার উপাসনা পর্যন্ত করে না। শাস্ত্র অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেবতা পূজার নির্দেশ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রে এই কথাও উল্লেখ আছে যে, প্রকৃতপক্ষে দেবতা উপাসনার কোন প্রয়োজনই নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, দেবতা উপাসনা থেকে যে ফল লাভ হয় তা স্থায়ী নয়। যেহেতু সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডই স্থায়ী নয়, তাই জড় অস্তিত্বের ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে যা কিছু লাভ করা যায়, তা-ও অস্থায়ী। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত এবং স্থায়ী জীবন কিভাবে লাভ করা যায়।

ভগবান বলেছেন যে, ভগবৎ সেবার দ্বারা যেমাত্র কেউ তাঁর কাছে পৌঁছয়—পরমেশ্বর ভগবানের কাছে অগ্রসর হওয়ার যা হচ্ছে একমাত্র

এবং কেবলমাত্র পন্থা—তখন তিনি জন্ম-মৃত্যুময় সংসার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। পক্ষান্তরে, মায়িক কবল থেকে মুক্তি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কপট ধার্মিকদের যেমন প্রকৃত জ্ঞান নেই, তেমনই জগৎ সংসারের কাজে বৈরাগ্যও নেই। তাদের অধিকাংশই ধর্মের নাম করে স্বার্থহীন এবং লোকহিতকর কাজ করার অছিলায় মায়ার বন্ধনরূপ স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায়। ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার মিথ্যা প্রদর্শনের দ্বারা তারা যখন সব রকম দুর্নীতিমূলক কাজের প্রশ্রয় দেয়, তখন তারা লোকদেখানো ভগবদ্ভক্তি উপস্থাপনা করে। এভাবেই তারা সদ্‌গুরু ও ভক্তরূপে স্বীকৃত হয়। এইপ্রকার ধর্মনীতি লঙ্ঘনকারীরা প্রামাণিক আচার্য এবং গুরু-পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত সাধুজনোচিত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার জন্য আচার্যদের নীতি অনুসরণ না করেই, তারা নিজেরা তথাকথিত আচার্য সেজে বসে।

এই ধর্মধ্বজী দুর্বৃত্তরা মানব-সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উৎপাত বিশেষ। যেহেতু ধার্মিক সরকার বা শাসকবর্গ না থাকায় তারা রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু তারা দৈবের বিধানের কবল থেকে রেহাই পায় না। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৬/১৯-২০) শ্রীভগবান স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম প্রচারকের বেশধারী এইসব ঈশ্বর-বিদ্বেষী অসুরেরা নরকের অন্ধকারতম অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হবে। *শ্রীঈশোপনিষদে* এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় যে এই সব কপট ধর্মাচার্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গুরুগিরির কাজ সমাপ্ত করে জগতের সবচেয়ে জঘন্যতম লোকে গতি লাভ করছে।

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অন্যৎ—অন্য; **এব**—অবশ্যই; **আহুঃ**—বলা হয়; **সম্ভবাৎ**—সকল কারণের কারণ, পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা; **অন্যৎ**—অন্য; **আহুঃ**—বলা হয়; **অসম্ভবাৎ**—যা পরম সত্য নয়, তার উপাসনা দ্বারা; **ইতি**—এভাবে; **শুশ্রুম**—আমি তা শুনেছি; **ধীরাণাম্**—ধীর ব্যক্তিদের থেকে; **যে**—যারা; **নঃ**—আমাদেরকে; **তৎ**—ওই বিষয়ে; **বিচচক্ষিরে**—ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে ধীর ব্যক্তিদের কাছে শ্রবণের পন্থা প্রমাণিত হয়েছে। পরিবর্তনশীল জগৎ সম্বন্ধে অবিচলিত প্রকৃত আচার্যের কাছ থেকে শ্রবণ করতে না পারলে, দিব্যজ্ঞানের যথার্থ পথের সন্ধান লাভ করা যায় না। যিনি ধীর আচার্যের কাছ থেকে শ্রুতি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ করেছেন, সেই সদ্‌গুরু কখনই বৈদিক শাস্ত্র-বহির্ভূত মনগড়া কোনও কিছু, উদ্ভাবন করেন না অথবা উপস্থাপিত করেন না। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৫) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পিতৃ উপাসকগণ

পিতৃলোক লাভ করেন। সেই রকম, যে-সব ঘোর জড়বাদী এখানে থাকার পরিকল্পনা করে, তারা পুনরায় এই জড় জগৎ প্রাপ্ত হয় এবং সকল কারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ছাড়া যাঁরা অন্য কারও উপাসনা করেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা চিদাকাশে তাঁর ধামে তাঁর কাছে উপনীত হন।

শ্রীঈশোপনিষদে এই মন্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিভিন্ন ধরনের উপাসনার দ্বারা বিভিন্ন ফল লাভ হয়। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করি, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে তাঁর নিত্য ধামে তাঁর কাছে পৌঁছব এবং আমরা যদি সূর্যদেবতা এবং চন্দ্রদেবতার মতো দেবতাদের উপাসনা করি, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁদের নিজস্ব গ্রহলোকগুলিতে আমরা পৌঁছতে পারি। আবার যদি আমরা আমাদের পরিকল্পনা কমিশন এবং সাময়িক রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিয়ে এই অধঃপতিত গ্রহলোকে থাকতে অভিলাষী হই, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে তাও করতে পারি।

প্রামাণিক শাস্ত্রের কোথাও বলা হয়নি যে, যে কেউ যে কোন কিছু অথবা যে কোন দেবতার উপাসনা করেই অন্তিমে একই গতি লাভ করবে। বৈধ সদ্‌গুরুর পরম্পরাবিহীন আচার্য অভিমানী ব্যক্তিরাই মূর্খের মতো এই প্রকার মতবাদ উপস্থাপিত করে। সদ্‌গুরু কখনই বলেন না যে, সমস্ত পন্থা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে এবং যে-কেউ তার নিজের মনগড়া পন্থায় দেবতা, ভগবান বা অন্য কারও উপাসনার দ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে। একজন সাধারণ মানুষও সহজেই বুঝতে পারে যে, তখনই সে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে যখন সে সেই গন্তব্যস্থানে যাবার টিকিট কাটবে। যে ব্যক্তি কলকাতার টিকিট কেটেছে সে কলকাতাতেই পৌঁছতে পারে—বম্বে নয়। কিন্তু তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী গুরুরা প্রচার করেন যে, যে কোনও এবং সমস্ত টিকিটই তাকে পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে।

এই ধরনের জড় ও আপোসমূলক মতবাদ বহু মূর্খ ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে যারা তাদের মনগড়া আত্ম-উপলব্ধির পন্থার দ্বারা গর্বিত। কিন্তু বৈদিক নির্দেশাবলী তাদের সমর্থন করে না। গুরু-পরম্পরার বৈধ ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত, কেউই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এভাবেই গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান লব্ধ হয়েছিল এবং রাজর্ষিরা তা একই পদ্ধতিতে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে পরম্পরা ছিন্ন হয় এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।"

(*গীতা* ৪/২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট তখন *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত এই ভক্তি-যোগের তত্ত্ব বিকৃত হয়ে পড়ে; তাই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ও ভক্ত অর্জুনকে দিয়ে গুরুশিষ্য পরম্পরার এই ধারা পুনরায় প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন (*গীতা* ৪/৩) যে, যেহেতু তিনি তাঁর ভক্ত ও সখা, তাই *ভগবদ্‌গীতার* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। পক্ষান্তরে, ভগবানের ভক্ত ও সখা না হলে কেউই *ভগবদ্‌গীতা* হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই কথার অর্থ এই যে, অর্জুনের পথ অনুসরণকারীই কেবল *ভগবদ্‌গীতা* হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

আজকাল এই মহান কথোপকথনের অনেক ভাষ্যকার এবং অনুবাদক আছে যাদের অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাবলী সম্পর্কে প্রকৃতই কোনও জ্ঞান নেই। তাদের স্বকল্পিত মতানুসারেই *ভগবদ্‌গীতার* শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করে এবং এই প্রকার ব্যাখ্যাকারেরা

শাস্ত্রগ্রন্থের নামে সব রকমের আবর্জনারই সৃষ্টি করে। এই সমস্ত ভাষ্যকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করে না, তাঁর নিত্য ধামকেও বিশ্বাস করে না। তা হলে তারা *ভগবদ্গীতা* ব্যাখ্যা কি করে করতে পারে?

গীতা (৭/২০) স্পষ্টভাবে বলছে যে, যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তারাই দেবতার উপাসনা করে। চরমে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন (*গীতা* ১৮/৬৬) যে, সব রকম পন্থা এবং উপাসনার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই শরণাগত হতে হবে। যারা সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত হয়েছে তাদেরই কেবল পরমেশ্বর ভগবানে এই রকম অপ্রতিহত শ্রদ্ধার উদয় হয়। অন্যরা তুচ্ছ উপাসনার পন্থার দ্বারা জড়-জাগতিক স্তরে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং এভাবেই সকল পথে একই গতি লাভ হয়—এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিপথে চালিত হয়।

এই মন্ত্রে *সম্ভবাৎ*, অর্থাৎ পরম কারণের উপাসনার দ্বারা—কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এবং অস্তিত্বশীল সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভব হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবসহ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা তিনি। যেহেতু জড় জগতের প্রধান তিন দেবতাকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তাই ভগবান হচ্ছেন জড় ও চিন্ময় জগতে যা কিছু অস্তিত্ব আছে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সেই রকম *অথর্ব বেদে* বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্বে যিনি বর্তমান ছিলেন এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। "পরমপুরুষ জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই ভগবান নারায়ণ জীবসমূহ সৃষ্টি করলেন। নারায়ণ থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। নারায়ণই সকল প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। নারায়ণ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। নারায়ণ অষ্ট বসুকে সৃষ্টি করেন। নারায়ণ একাদশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। নারায়ণ দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি করেন।" নারায়ণ যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, তাই নারায়ণ এবং কৃষ্ণ একই। অন্যান্য আরও বহু শাস্ত্রে লিখিত হয়েছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। যদিও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সবিশেষবাদী ছিলেন না, তবুও তিনি দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা এবং নারায়ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা স্বীকার ও প্রমাণ করেছেন। *অথর্ব বেদে* আরও বলা হয়েছে—"সর্বপ্রথমে একমাত্র নারায়ণই বর্তমান ছিলেন—ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, জল, নক্ষত্র, সূর্য বা চন্দ্র কিছুই তখন ছিল না। ভগবান কখনই একা থাকেন না, কিন্তু স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেন।" *মোক্ষধর্মে* বলা হয়েছে—"আমি প্রজাপতি এবং রুদ্রগণকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাঁরা আমার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত বলেই আমার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নন।" *বরাহ পুরাণে* বলা হয়েছে—"নারায়ণই পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর থেকেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং রুদ্র প্রকাশিত হন,—যাঁরা পরবর্তী কালে সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠেন।"

এভাবেই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল কারণের কারণ। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, যিনি সমস্ত জীবের আনন্দ প্রদানকারী এবং সর্বকারণের আদি কারণ। যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি *বেদ* এবং মহাঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণ থেকে এটি জানেন। এভাবেই বিদ্বান ব্যক্তি সর্বেশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন।

যারা একমাত্র কৃষ্ণ উপাসনাতেই দৃঢ়ব্রত, তাঁরাই যথার্থ *বুধ* অর্থাৎ বিদ্বান বলে পরিগণিত হন। কেউ যখন প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ধীর আচার্যের মুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করেন তখনই এই রকম দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। যার কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নেই, তার এই সরল সত্যে বিশ্বাস হবে না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১)

এই রকম অবিশ্বাসীদের মূঢ় বা গর্দভ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই সব মূঢ়রা পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করে, যেহেতু তারা আচার্যের কাছ থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি। যে জড়া প্রকৃতির ঘূর্ণাবর্তে চঞ্চল ও অধীর, সে আচার্য হওয়ার যোগ্য নয়।

ভগবদ্‌গীতা শোনার আগে অর্জুন পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি আসক্তিবশত জড়-জাগতিক ঘূর্ণাবর্তে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই অর্জুন জড় জগতের একজন অহিংস এবং মানব-হিতৈষী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরম পুরুষের কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতার* বৈদিক জ্ঞান শুনে তিনি যখন *বুধ* হন, তখন তিনি তাঁর সংকল্প পরিবর্তন করেন এবং কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হয়। অর্জুন তাঁর তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করেই ভগবানের উপাসনা করেন। এভাবেই তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন। প্রকৃত কৃষ্ণের উপাসনার দ্বারাই এই রকম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব—*ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের আবিষ্কৃত সাজানো বা জাল 'কৃষ্ণ'-উপাসনার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

বেদান্তসূত্র অনুসারে *সম্ভূত* হচ্ছে জন্মের উৎস, পুষ্টিসাধন এবং আধার যা প্রলয়ের পর বর্তমান থাকে। একই গ্রন্থকারের দ্বারা রচিত *বেদান্ত-সূত্রের* স্বাভাবিক ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসারে প্রকাশিত সব কিছুর উৎস কোন প্রাণহীন প্রস্তর নয়। বরং তিনি *অভিজ্ঞ*—পূর্ণ চেতন। আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৬) বলেছেন যে, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং কোন দেবতাই, এমন কি শিব, ব্রহ্মা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানেন না। সুতরাং যারা জড় অস্তিত্বের জোয়ার-ভাটার দ্বারা বিচলিত, তারা কখনই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। এই রকম অর্ধশিক্ষিত আচার্যরা জনগণকে উপাস্য বস্তুতে পরিণত করে

আপোসে মীমাংসা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানে না যে, এই প্রকার উপাসনা কখনই সম্ভব নয়, কারণ জনগণ সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয়। তাদের প্রচেষ্টা অনেকটা গাছের শিকড়ে জল না দিয়ে পাতায় জল ঢালার মতন। গাছের শিকড়ে জল সিঞ্চন করাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু বর্তমান কালের অশান্ত, অধীর নেতারা পাতায় জল সিঞ্চন করতেই আসক্ত। তাই গাছের পাতায় অনবরত জল সিঞ্চন করা সত্ত্বেও, পুষ্টির অভাবে গাছের সমগ্র অংশ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঈশোপনিষদ আমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছে যে সকল অঙ্কুরের উৎস শিকড়েই জল সিঞ্চন করতে হবে। জড় দেহের সেবার মাধ্যমে মানবজাতির উপাসনা কখনই ত্রুটিহীন হবে না এবং তার গুরুত্ব আত্মার সেবা অপেক্ষা কম। আত্মাই হচ্ছে গাছের শিকড় যা কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দেহ উৎপন্ন করে। চিকিৎসা, সামাজিক সুব্যবস্থা ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে জনসেবা এবং পাশাপাশি কসাইখানায় হতভাগ্য পশুদের গলা কাটা প্রকৃতপক্ষে জীবদের প্রতি যুক্তিসঙ্গত সেবা নয়।

জীবেরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির ক্লেশের মাধ্যমে প্রাকৃত বিভিন্ন ধরনের দেহে অবিরাম দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। ভগবানের সঙ্গে জীবের হারানো সম্পর্ক কেবলমাত্র পুনঃস্থাপনের দ্বারা মনুষ্যজীবনে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ দান করা হয়েছে। সম্ভূত অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শরণাগতির এই দর্শন শিক্ষা দিতেই ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন। যখন কেউ পূর্ণপ্রীতি ও পূর্ণশক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শরণাগতি এবংউপাসনার শিক্ষা দান করে, তখনই প্রকৃত মানবসেবা সম্পাদিত হয়। *শ্রীঈশোপনিষদের* এই মন্ত্রে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়।

ভগবানের মহান কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তনই হচ্ছে এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কলিযুগে ভগবৎ-উপাসনার সহজ উপায়। কিন্তু মনোধর্মী-

প্রসূত জল্পনা-কল্পনাকারীরা মনে করে যে, ভগবানের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে কাল্পনিক; তাই তারা ভগবৎ-লীলা শ্রবণে বিরত থাকে এবং অজ্ঞ জনসাধারণের মনোযোগ বিপথে চালিত করার জন্য কিছু সারবত্তাহীন কথার ভেল্কি উদ্ভাবন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ শ্রবণের পরিবর্তে ভণ্ড গুরুদের প্রচারের জন্য নিজেদের অনুগামীদের প্ররোচিত করার মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের বিজ্ঞাপিত করছে। আজকাল এই প্রকার ছলনাকারীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সব ছলনাকারী নকল অবতারদের অপপ্রচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপনিষদগুলি পরোক্ষভাবে আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায়, কিন্তু সকল *উপনিষদের* সারাংশ *ভগবদ্‌গীতা* প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করায়। *ভগবদ্‌গীতায়* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে শ্রবণের দ্বারা মন ক্রমশ সমস্ত কলুষিত বিষয় থেকে নির্মল হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"ভগবানের ক্রিয়াকলাপ শ্রবণের দ্বারাই ভক্ত তাঁর দিকে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এভাবেই প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, ভগবান ভক্তকে উপযোগী নির্দেশাবলী দান করে তাঁকে সহায়তা করেন।" *ভগবদ্‌গীতায়ও* (১০/১০) এটি প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভগবানের অন্তরের নির্দেশ রজ ও তমোগুণ জাত কলুষতা থেকে ভক্তের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। অভক্তেরা রজ ও তমোগুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রজোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে অনাসক্ত হতে পারে না এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি সে কে এবং ভগবান কে জানতে পারে না। এভাবেই ধার্মিক ব্যক্তির ভূমিকায় যতই সে অভিনয় করুক না কেন, রজ গুণ এবং তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি

কখনই আত্ম-উপলব্ধি লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ভক্তের ক্ষেত্রে, ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের তম ও রজোগুণ দূরীভূত হয় এভাবেই ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, যা যথার্থ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। প্রত্যেকে এবং যে-কেউ ব্রাহ্মণরূপে যোগ্য হতে পারেন যদি তিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (২/৪/১৮) বলা হয়েছে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় নীচকুলে জাত যে-কোনও জীব শুদ্ধ ও পবিত্র হতে পারে, কেন না ভগবান হচ্ছেন অসাধারণ শক্তিমান।"

কেউ যখন ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করেন, তখন তিনি ভগবৎ-সেবায় আনন্দিত এবং উৎসাহী হন। তখন আপনা থেকেই ভগবৎ-বিজ্ঞান তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান জানার ফলে, ক্রমশ তিনি জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং ভগবানের-কৃপায় তাঁর সংশয়যুক্ত মন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হয়। কেউ যখন এই স্তর লাভ করেন, তখন তিনি মুক্তাত্মা হন এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ভগবৎ-দর্শন লাভ করেন। এটিই *সম্ভবাৎ* -এর সাফল্য, যা এই মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

সম্ভূতিম্—শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈচিত্র্যময় তাঁর ধাম ইত্যাদি; **চ**—এবং; **বিনাশম্**—মিথ্যা নাম, যশ আদি সহ দেবতা, মানুষ ও পশু ইত্যাদির অস্থায়ী জড়-জাগতিক প্রকাশ; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **তৎ**—তা; **বেদ**—জানেন; **উভয়ম্**—উভয়; **সহ**—সহিত; **বিনাশেন**—বিনাশী সব কিছু সহ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **তীর্ত্বা**—অতিক্রম করে; **সম্ভূত্যা**—ভগবানের নিত্যধামে; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **অশ্নুতে**—ভোগ করে।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ ও পশুকুল সহ অনিত্য জগৎ সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ-ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

মানব-সভ্যতা তথাকথিত জড় জ্ঞানের উন্নতির দ্বারা মহাকাশযান এবং আণবিক শক্তি সহ বহু জড় দ্রব্য তৈরি করেছে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখনই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের কাছে এই সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন বৈজ্ঞানিকটি অত্যন্ত চতুরভাবে উত্তর দেন

যে, জড় বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে মৃত্যুহীন ও চিরতরুণ করা সম্ভব হবে। এই ধরনের উত্তর জড়া প্রকৃতি সম্বন্ধে জড় বৈজ্ঞানিকদের চরম অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। এই জড় জগতে সব কিছুই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মাধীন এবং জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, পরিবর্তন, ক্ষয় ও অন্তিমে মৃত্যু—এই ছয়টি অবস্থার মধ্য দিয়ে সকল জীবকেই যেতে হয়। জড়া প্রকৃতির সম্পর্কজাত কোন কিছুই এই ছয়টি অবস্থার অতীত নয়; তাই দেবতা, মানুষ, পশু বা বৃক্ষ কেউই চিরকাল এই জড় জগতে বেঁচে থাকতে পারে না।

প্রজাতি অনুসারে জীবনকাল বিভিন্ন। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান জীব ব্রহ্মা কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকতে পারে, আবার ক্ষুদ্র জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে সামান্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেউই এই জড় জগতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। কোন বিশেষ অবস্থায় কারও জন্ম বা সৃষ্টি হয়, তারা কিছুকাল অবস্থান করে এবং যদি তার জীবন থাকে, তবে তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জন্মদান করে, ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বিনাশ হয়। এই নিয়ম অনুসারে এমন কি বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণও আজই হোক বা কালই হোক সকলেই মৃত্যুর অধীন। এই জন্য সমগ্র জড় জগৎকে মৃত্যুলোক বলা হয় অর্থাৎ যে-স্থানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদদের যেহেতু মৃত্যুহীন চিন্ময় জগতের কোন সংবাদ জানা নেই, তাই তারা এই জড় জগৎকে মৃত্যুহীন করার জন্য সচেষ্ট। পরিপক্ক অপ্রাকৃত জ্ঞানে পরিপূর্ণ বৈদিক সাহিত্যে অজ্ঞতাই এর কারণ। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক কালের মানুষ *বেদ, পুরাণ* ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে জ্ঞান লাভের বিরোধী।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরা (উৎকৃষ্ট) এবং অপরা (নিকৃষ্ট) নামে বিবিধ শক্তি ধারণ করেন। যে জড়া শক্তিতে আমরা বর্তমানে জড়িত তাকে বলা হয় অবিদ্যা বা

নিকৃষ্টা শক্তি। এই শক্তির দ্বারা জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট আর একটি শক্তিকে বলা হয় পরাশক্তি এবং এই পরাশক্তি নিকৃষ্ট জড় শক্তি থেকে ভিন্ন। সেই পরাশক্তি ভগবানের শাশ্বত বা মৃত্যুহীন সৃষ্টি গঠন করে। (*ভঃ গীঃ* ৮/২০)

সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি সহ ঊর্ধ্ব, অধঃ ও মধ্যবর্তী— সমগ্র জড় গ্রহমণ্ডল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। এই সমস্ত গ্রহমণ্ডল ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্মার একটি দিন গত হলেই অধঃলোকে কিছু কিছু গ্রহমণ্ডল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মার পরবর্তী দিনে এই সমস্ত গ্রহের আবার সৃষ্টি হয়। ঊর্ধ্বলোকে কাল ভিন্নভাবে গণনা করা হয়। মধ্যলোকের এক বছর ঊর্ধ্বলোকের অনেক গ্রহমণ্ডলের চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন ও রাতের সমান। ঊর্ধ্বলোকের কাল গণনা হিসাবে আমাদের পৃথিবীর চার যুগের—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সময়কাল মাত্র বারো হাজার বছর। এই দীর্ঘ সময়কালকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে ব্রহ্মার একটি দিনের সমান হবে এবং তাঁর একটি রাতের সময়কাল তাঁর একটি দিনের সমান। এই রকম দিন ও রাত্রিকাল গণনার দ্বারা ব্রহ্মার মাস ও বছর গণনা করা হয় এবং এই সময়ের হিসাবেই ব্রহ্মার জীবনকাল একশ বছর। ব্রহ্মার জীবন অবসানে প্রকটিত এই সমগ্র বিশ্বের বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে সব জীব সূর্য, চন্দ্র এবং মর্ত্যলোকের নিয়মাধীন এই পৃথিবী ও নিম্নস্থ বহু গ্রহে বাস করে, তারা সকলে ব্রহ্মার রাত্রিকালে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়। এই সময়ে কোনও জীব বা প্রজাতি প্রকটিত থাকে না, যদিও চিন্ময়ভাবে তারা বর্তমান থাকে। এই অপ্রকট অবস্থাকে অব্যক্ত বলে। আবার ব্রহ্মার জীবন অবসানে যখন সমগ্র বিশ্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর একটি অব্যক্ত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু এই দুই অব্যক্ত অবস্থার অতীত চিন্ময় পরিবেশ বা প্রকৃতি রয়েছে। এই পরিবেশে অসংখ্য চিন্ময় গ্রহলোক রয়েছে এমন কি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের

সমস্ত গ্রহলোকগুলি যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন এই চিন্ময় গ্রহগুলি নিত্যকাল বিরাজমান থাকে। অসংখ্য ব্রহ্মার কর্তৃত্বাধীন এই মহাজাগতিক প্রকাশ ভগবানের শক্তির এক চতুর্থাংশ মাত্র। এই শক্তিকে অপরা প্রকৃতি বলে। ব্রহ্মার সৃষ্টির অতীত ভগবানের শক্তির তিন-চতুর্থাংশ শক্তিকে ত্রিপাদ বিভূতি বলা হয়। এটিই হচ্ছে উৎকৃষ্টশক্তি, অর্থাৎ পরা প্রকৃতি।

পরা প্রকৃতিতে বসবাসকারী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী পরমপুরুষ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৮/২২) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, একমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় এবং জ্ঞান, যোগ বা কর্মের পন্থার দ্বারা নয়। সকাম কর্মীরা নিজেদের সূর্য, চন্দ্র সহ স্বর্গ লোকে উন্নীত করতে পারেন। জ্ঞানী এবং যোগীরা আরও উচ্চতর লোকগুলি লাভ করতে পারেন, যেমন ব্রহ্মালোক এবং ভগবদ্ভজন দ্বারা যখন তাঁরা আরও যোগ্যতা সম্পন্ন হন, তখন তাঁদের গুণগত যোগ্যতা অনুসারে তাঁরা ভগবানের পরা প্রকৃতিসম্ভূত ব্রহ্মজ্যোতিতে অথবা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। যাই হোক, এটি নিশ্চিত যে, ভগবদ্ভজন অনুশীলন ছাড়া কেউই চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন না।

জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত প্রত্যেকেই জড়া প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছে এবং এটিই হচ্ছে ভবরোগ। যতক্ষণ এই ভবরোগে আক্রান্ত থাকবে, ততক্ষণ জীবকে দৈহিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অধীনে থাকতে হয়। সে মানুষ, দেবতা বা পশু যে দেহই গ্রহণ করুক না কেন, ব্রহ্মার রাত্র ও জীবনাবসান—এই দুই প্রলয় সময়ে তাকে অব্যক্ত অবস্থা লাভ করতে হয়। আমরা যদি পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর এই প্রক্রিয়া এবং জড়া ও ব্যাধির আনুষঙ্গিক কারণের পরিসমাপ্তি করতে চাই, তা হলে চিন্ময় গ্রহলোকে প্রবেশ করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশরূপে এই সমস্ত গ্রহলোকের প্রত্যেকটিতে প্রভুত্ব করেন।

কেউ শ্রীকৃষ্ণের ওপর আধিপত্য করতে পারে না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করে এবং পরিণামে সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখকষ্টের অধীন হয়ে পড়ে। ধর্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ভগবান এখানে আসেন এবং তাঁর প্রতি শরণাগতির আন্তরিক প্রয়াস বর্ধিত করাই মূল নীতি। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) এটি হচ্ছে ভগবানের অন্তিম নির্দেশ, কিন্তু মূর্খ লোকেরা সুকৌশলে এই মূল শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে সাধারণ লোকদের বিপথে চালিত করছে। হাসপাতাল খোলার জন্য জনগণকে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভজন দ্বারা চিন্ময় জগতে প্রবেশ লাভের শিক্ষা তাঁদের দেওয়া হয়নি। জীবের প্রকৃত সুখ যার মাধ্যমে কোনও দিন হবে না, সেই অনিত্য ত্রাণকার্যে উৎসাহী হওয়ার জন্যই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা নানা জনসেবামূলক ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান চালু করে। কিন্তু দুরতিক্রম্যা প্রকৃতিকে শান্ত করার উপায় তারা জানে না। বহু মানুষকে *ভগবদ্গীতার* বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু যার দ্বারা জড়া প্রকৃতি শান্ত হতে পারে *গীতার* সেই বাণীকে তারা উপেক্ষা করে। একমাত্র ভগবদ্ভাবনা জাগ্রত করার মাধ্যমেই প্রবলা মায়া শান্ত হতে পারে, যা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই মন্ত্রে *শ্রীঈশোপনিষদ* শিক্ষা দিচ্ছে যে, *সম্ভূতি* (পরমেশ্বর ভগবান) ও *বিনাশ* (অস্থায়ী জড় প্রকাশ) উভয় সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে অবশ্যই জানা কর্তব্য। কেবল অস্থায়ী জড় প্রকাশকে জানার ফলে, কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারা যায় না, কারণ প্রকৃতির গতিপথে প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস সাধন হচ্ছে। হাসপাতাল খোলার দ্বারা এই ধ্বংস সাধন থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। একমাত্র চিদানন্দময় শাশ্বত জীবনের পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই যে-কেউ রক্ষা পেতে পারে। সমগ্র

বৈদিক প্রণালীর উদ্দেশ্যই হচ্ছে শাশ্বত জীবন লাভের এই কৌশল শিক্ষাদান করা। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণীয় দ্রব্য দ্বারা জনগণ বিপথে চালিত হচ্ছে, কিন্তু ইন্দ্রিয় বিষয়বস্তুর প্রতি সেবানুষ্ঠান বিভ্রান্তিকর ও মর্যাদাহানিকর।

সুতরাং যথার্থ উপায়েই আমাদের অনুগামীদের আমরা অবশ্যই রক্ষা করব। সত্য প্রিয় কি অপ্রিয় সেটি বড় কথা নয়, সত্য সর্বদাই বিরাজমান। আমরা যদি এই জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে উদ্ধার পেতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করতে হবে। আপসে মীমাংসা হতে পারে না, কেন না এটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

মন্ত্র পনের

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্ময়েন—সুবর্ণ জ্যোতির দ্বারা; **পাত্রেণ**—উজ্জ্বল আবরণের দ্বারা; **সত্যস্য**—পরম সত্যের; **অপিহিতম্**—আচ্ছাদিত; **মুখম্**—মুখ; **তৎ**—সেই আচ্ছাদন; **ত্বম্**—আপনাকে; **পূষন্**—হে প্রতিপালক; **অপাবৃণু**—কৃপা করে অপসারণ করুন; **সত্য**—শুদ্ধ; **ধর্মায়**—ভক্তের কাছে; **দৃষ্টয়ে**—প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে সর্বজীব পালক, আপনার উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা আপনার প্রকৃত মুখারবিন্দ আচ্ছাদিত। কৃপা করে সেই আচ্ছাদন দূর করুন এবং আপনার শুদ্ধ ভক্তের নিকট নিজেকে প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান তাঁর ব্যক্তিগত রশ্মি ব্রহ্মজ্যোতি অর্থাৎ তাঁর সাকার রূপের উজ্জ্বল জ্যোতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

"আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ।" (*ভঃ গীঃ* ১৪/২৭) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান হচ্ছেন একই পরমতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ। পরমার্থ অনুশীলনে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মানুভূতি হয়। অনুশীলনে আরও উন্নতি হলে পরমাত্মা অনুভব হয় এবং ভগবান উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি। এটি *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে,

যেখানে ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতি ও সর্বব্যাপী পরমাত্মার মূল উৎস পরমতত্ত্বের চরম ধারণা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণা ব্রহ্মজ্যোতির অন্তিম উৎস এবং তাঁর অসীম শক্তি ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"কিন্তু অর্জুন এই সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের কি প্রয়োজন? আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগতে আমি পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।" (*ভঃ গীঃ* ১০/৪২) এভাবেই তাঁর অংশ-প্রকাশ এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা সম্পূর্ণ জড় মহাজাগতিক সৃষ্টিকে পালন করেন। সেই সঙ্গে চিন্ময় জগতে সমস্ত প্রকাশও তিনি প্রতিপালন করেন; অতএব *শ্রীঈশোপনিষদের* এই মন্ত্রে ভগবানকে *পূষন্,* অর্থাৎ পরম পালকরূপে সম্বোধন করা হয়েছে।

পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন (*আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*)। পাঁচ হাজার বৎসর আগে তিনি যখন ভারতের শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন বাল্যলীলার প্রারম্ভ থেকেই তিনি সব সময় অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকতেন। অঘ, বক, পূতনা ও প্রলম্বাদি অসুর বধ ছিল তাঁর আনন্দময় প্রমোদ ভ্রমণ। বৃন্দাবনের গ্রামে মাতা, ভ্রাতা ও সখাদের সঙ্গে তিনি নিজে আনন্দ উপভোগ করতেন এবং যখন তিনি দুষ্ট মাখন-চোরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন ভাঁড় চুরি করার জন্য তাঁর সমস্ত পার্ষদেরা দিব্য আনন্দ উপভোগ করতেন। মাখন-চোররূপে ভগবানের খ্যাতি নিন্দনীয় নয়, কেন না মাখন চুরির দ্বারা তার শুদ্ধ ভক্তদের ভগবান আনন্দ দান করতেন। শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের দ্বারা যা কিছুর অনুষ্ঠান হত তা ছিল তাঁর

পার্ষদদের আনন্দের জন্য। পরমার্থ অনুসন্ধানী তথাকথিত হঠযোগ কসরৎ অনুশীলনকারী এবং শুষ্ক মনোধর্মী জ্ঞানী ও কুতার্কিকদের আকর্ষণের জন্যই ভগবান এই সমস্ত লীলা সৃষ্টি করেন।

খেলার সাথী গোপবালকদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতে* শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

"নিরাকার, ব্রহ্মানন্দরূপে যাঁকে উপলব্ধি করা যায়, ভক্তগণ যাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে উপাসনা করেন, মায়াবদ্ধ জীবগণ যাঁকে সাধারণ মানুষরূপে গণ্য করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপবালকেরা জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে সখারূপে খেলা করছেন।" (*ভাঃ* ১০/১২/১১)

এভাবেই ভগবান শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যাদি বিভিন্ন সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর মুক্ত পার্ষদদের সাথে নিরন্তর অপ্রাকৃত প্রণয়পূর্ণ ক্রিয়াকলাপে নিয়ত থাকেন।

যেহেতু বলা হয়েছে যে, ভগবান কখনও শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিত্যাগ করেন না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কিভাবে তিনি নিখিল সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/১৪) বলা হয়েছে—ভগবান তাঁর স্বাংশ পুরুষাবতার রূপে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। প্রাকৃত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে যদিও ভগবানের ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করার নেই, তবুও তাঁর অংশ-প্রকাশ পরমাত্মার দ্বারা তিনি এই সমস্ত কার্য করান। প্রত্যেক জীবই আত্মারূপে পরিচিত এবং সমস্ত আত্মার নিয়ন্ত্রণকারী মুখ্য আত্মা হচ্ছেন পরমাত্মা।

ভগবৎ-উপলব্ধির এই পন্থা হচ্ছে একটি মহৎ বিজ্ঞান। জড়বাদীরা জাগতিক সৃষ্টির চব্বিশটি তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং সেই সম্বন্ধে ধ্যান করতে পারে, কারণ পুরুষ বা ভগবান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অল্প। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতির উজ্জ্বল আলোকরশ্মির দ্বারাই কেবল বিভ্রান্ত। যিনি পরমতত্ত্বের পূর্ণ দর্শন লাভ করতে চান, তাঁকে এই চব্বিশটি তত্ত্ব এবং তার অতীত উজ্জ্বল জ্যোতির স্তর ভেদ করতে হবে। *হিরণ্ময়-পাত্র,* অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আবরণ অপসারণের প্রার্থনা জানিয়ে *শ্রীঈশোপনিষদ* এই লক্ষ্যের দিকে পথনির্দেশ দিচ্ছে। এই জ্যোতির্ময় আবরণের অপসারণ ভিন্ন কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না এবং পরমতত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মারূপ হচ্ছেন তিনটি স্বাংশ তত্ত্বের একটি এবং সমষ্টিগতভাবে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণুতত্ত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই তিন মুখ্য দেবতার এক জন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে অভিহিত। তিনি প্রতি জীবের মধ্যে সর্বব্যাপী পরমাত্মারূপে বিরাজিত। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সকল জীবের সমষ্টি অন্তর্যামী। এই দুজন ছাড়াও কারণ-সমুদ্রে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু শায়িত আছেন। তিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। যোগপদ্ধতি একনিষ্ঠ যোগ অনুশীলনকারীকে শিক্ষা দেয় যে, কিভাবে এই জড় সৃষ্টির চব্বিশটি উপাদান অতিক্রম করে বিষ্ণুতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানালোচনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল আলোক নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধির সহায়ক। এটি যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, তেমনই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন বিভূতি-সম্পন্ন বৈচিত্র্যময় অসংখ্য গ্রহমণ্ডল রয়েছে এই সব গ্রহমণ্ডল ব্রহ্মজ্যোতির এককোণে অবস্থান করছে। এই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে আমার উপাস্য পুরুষোত্তম ভগবানের অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত রশ্মিচ্ছটা।" *ব্রহ্ম-সংহিতার* এই মন্ত্রটি পরমতত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে উক্ত হয়েছে এবং *শ্রীঈশোপনিষদের শ্রুতি মন্ত্র* আলোচিত এই মন্ত্রটিকে আত্ম-উপলব্ধির পন্থারূপে প্রতিপন্ন করেছে। ব্রহ্মজ্যোতি অপসারণের জন্য এটি কেবল ভগবানের কাছে একটি প্রার্থনা যাতে তাঁর প্রকৃত মুখমণ্ডল দর্শন করা যায়।

পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্মের উৎস সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ব্রহ্মের উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতাদি* শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্ব পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব প্রতিপাদন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে কারও উপলব্ধি অনুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বা ভগবানরূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব কখনই বলেননি যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন সাধারণ জীব। জীবকে সর্বশক্তিমান পরমতত্ত্ব রূপে কখনই বিবেচনা করা উচিত নয়। যদি তা-ই হত, তবে ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শনের জন্য তাঁর জ্যোতির্ময় আবরণ অপসারণের জন্য জীবের প্রার্থনা করার প্রয়োজন হত না।

তা হলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পরমতত্ত্বের চিন্ময়, শক্তিমান প্রকাশের অনুপস্থিতিতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি হয়। সেই রকম, কেউ যখন ভগবানের চিৎ-শক্তিহীন জড়া শক্তিকে উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর পরমাত্মা উপলব্ধি হয়। এভাবেই পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। যাই হোক, *হিরণ্ময়পাত্র* উন্মোচন করার পর কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-শক্তিতে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—সমস্ত কিছুই। তিনি হচ্ছেন ভগবান বা মূল। আর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁর শাখা-প্রশাখা।

ভগবদ্গীতায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক (জ্ঞানী), পরমাত্মার উপাসক (যোগী) এবং শ্রীকৃষ্ণ উপাসক (ভক্ত)—এই তিন রকমের পরমার্থীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ আছে। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৬-৪৭) বলা হয়েছে যে, সকল প্রকার পরমার্থবাদীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, যিনি বৈদিক জ্ঞান অনুশীলন করেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তবুও যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মী অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আবার সব রকম যোগীর মধ্যে যিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সংক্ষেপে বলা যায়, কর্মী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেয় এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেয়। কিন্তু সকল যোগীর মধ্যে যিনি সব সময় ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এভাবেই সাফল্য অর্জনের জন্য *শ্রীঈশোপনিষদ* আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

পূষন্—হে পালনকর্তা; **একর্ষে**—আদি জ্ঞানী; **যম**—মুখ্য নিয়ন্ত্রণকারী; **সূর্য**—মহাভাগবতদের গন্তব্যস্থল; **প্রাজাপত্য**—প্রজাপতিদের সুহৃদ; **ব্যূহ**—অপসারণ করুন; **রশ্মীন্**—রশ্মি; **সমূহ**—কৃপা করে প্রত্যাহার করুন; **তেজঃ**—জ্যোতি; **যৎ**—যাতে; **তে**—আপনার; **রূপম্**—রূপ; **কল্যাণতমম্**—সবচেয়ে কল্যাণময়; **তৎ**—তা; **তে**—আপনার; **পশ্যামি**—আমি দর্শন করতে পারি; **যঃ**—যিনি হন; **অসৌ**—সূর্যের মতো; **অসৌ**—ওই; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান; **সঃ**—আমি স্বয়ং; **অহম্**—আমি; **অস্মি**—হই।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ—কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

সূর্য এবং সূর্যকিরণ গুণগতভাবে এক ও অভিন্ন। সেই রকম, গুণগত বিচারে ভগবান ও জীব এক এবং অভিন্ন। সূর্য একটি, কিন্তু সূর্য

কিরণের কণাগুলি অসংখ্য। সূর্যরশ্মি সূর্যেরই অংশ, আর সূর্য ও তাঁর রশ্মি সম্মিলিতভাবেই পূর্ণসূর্য। সূর্যলোকের মধ্যেই সূর্যদেব বসবাস করেন, এবংসেই রকম যেখান থেকে ব্রহ্মজ্যোতি নিঃসৃত হয়, সেই চিন্ময়পরম গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবনেই সনাতন ভগবান বসবাস করেন, যেমন *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণির দ্বারা রচিত ধামে, সমস্ত বাসনা পূরণকারী সুরভি গাভীদের পালন করছেন এবং যিনি নিরন্তর শত শত লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/২৯)

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, সূর্যগোলক থেকে যেমন সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয়, ঠিক তেমনভাবেই পরমচিন্ময় গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবন থেকে ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোক অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভগবৎ-ধামের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোকচ্ছটায় অন্ধ হয়ে নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের পরম ধাম যেমন উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁর অপ্রাকৃত রূপও উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সীমিত অপরিপক্ক জ্ঞানের প্রভাবে এই প্রকার নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় অপ্রাকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই *শ্রীঈশোপনিষদের* এই প্রার্থনায় ব্রহ্মজ্যোতির উজ্জ্বল আলোক সংবরণ করতে শ্রীভগবানের কাছে আবেদন করা হয়েছে যাতে তাঁর সর্ব আনন্দময় অপ্রাকৃত রূপ শুদ্ধ ভক্ত দর্শন করতে পারেন।

নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধির দ্বারা ভগবানের মঙ্গলময় রূপকে অনুভব করা যায় এবং ভগবানের সর্বব্যাপী রূপ বা পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা আরও মঙ্গলময় দিব্য অনুভূতি হয়, কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের সবচেয়ে মঙ্গলময় রূপকে অনুভব করেন। যেহেতু তিনি আদি কবি, জগতের প্রতিপালক ও সুহৃদরূপে অভিহিত হন, তাই পরমতত্ত্ব নির্বিশেষরূপে গণ্য হতে পারে না। এটিই হচ্ছে *শ্রীঈশোপনিষদের* নির্দেশ। এই মন্ত্রে *পূষন্* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূষন্ প্রতিপালক কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেন না যদিও ভগবান সকল প্রাণীদের প্রতিপালন করেন, তবুও—তিনি বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদেরকে প্রতিপালন করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অতিক্রম করবার পর এবং ভগবানের সবিশেষ সর্বমঙ্গলময় রূপ দর্শন করে, ভক্ত পরমতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন।

ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন—"পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পরমতত্ত্বের পূর্ণ ধারণা উপলব্ধি করা যায়, কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে পরমতত্ত্বের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করা যায় না; তাই ব্রহ্ম-উপলব্ধি হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবানের কেবলমাত্র আংশিক উপলব্ধি। হে জ্ঞানবান ঋষিগণ; *ভগবান্* শব্দের প্রথম অক্ষরটি দুটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ—প্রথমত 'যিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন' এই অর্থে এবং দ্বিতীয়তঃ 'অভিভাবক' অর্থে। দ্বিতীয় অক্ষর (*গ*) অর্থ পথপ্রদর্শক, পরিচালক বা স্রষ্টা। *ব* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, সমস্ত জীবেরা তাঁর মধ্যে বাস করে এবং তিনিও সমস্ত জীবের মধ্যে বাস করেন। পক্ষান্তরে, অপ্রাকৃত শব্দ *ভগবান* সম্পূর্ণভাবে জড় হেয়তাশূন্য অসীম জ্ঞান, বিভূতি, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল এবং প্রতিপত্তির প্রতীক।"

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দকে পূর্ণভাবে প্রতিপালন করেন এবং ভগবদ্ভক্তির সাফল্যের পথে ক্রমশ উন্নতি সাধনের জন্য তিনি তাঁদেরকে পরিচালিত করেন। তাঁর ভক্তদের পরিচালক হিসাবে নিজেকে স্বয়ং তাঁদের দান করে, তিনি চরমে ভগবদ্ভক্তির বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভগবদ্ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবানকে চাক্ষুষ দর্শন করেন; এভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবন পৌঁছতে ভগবান তাঁর ভক্তদের সহায়তা করেন। স্রষ্টা হওয়ার ফলে তাঁর ভক্তদের তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদান করতে পারেন, যাতে ভক্ত পরিশেষে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন। ভগবান সর্বকারণের কারণ, এবং যেহেতু তাঁর কোন কারণ নেই, তাই তিনিই হচ্ছেন আদি কারণ। সুতরাং তাঁর নিজের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আত্মমায়া প্রকাশ করে তিনি নিজেকেই উপভোগ করেন। বহিরঙ্গা শক্তি ঠিক তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় না, কেন না তিনি নিজেকে পুরুষরূপে বিস্তার করেন এবং এই সকল রূপেই তিনি জড় প্রকাশকে প্রতিপালন করেন। এই প্রকার অংশ-বিস্তার দ্বারা তিনি জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন।

জীবেরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং যেহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রভু হওয়ার ও পরমেশ্বর ভগবানকে অনুকরণ করার বাসনা পোষণ করে, তাই প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার তাদের প্রবণতাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্য তিনি তাদেরকে পছন্দ করার ক্ষমতা সহ জড় জগতে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। তাঁর অবিচ্ছিন্ন অংশ জীবদের উপস্থিতিতে দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আলোড়িত হয়। এভাবেই জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার সব সুযোগই জীবদের প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা রূপে ভগবান স্বয়ং এবং পরমাত্মা একজন পুরুষাবতার।

তাই জীব বা আত্মা এবং পরম নিয়ন্তা পরমাত্মার মধ্যে অনেক ভেদ আছে। পরমাত্মা হচ্ছেন নিয়ন্তা এবং আত্মা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত জীব; তাই তাঁরা একই স্তরের নয়। পরমাত্মা যেহেতু আত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন, তাই তিনি জীবাত্মার সর্বক্ষণের সহচর রূপে পরিজ্ঞাত।

ভগবানের সর্বব্যাপী রূপ—সুপ্ত, জাগ্রত ও অব্যক্ত সর্ব অবস্থায় যা বর্তমান এবং যা থেকে বদ্ধ ও মুক্ত-আত্মারূপে জীবশক্তির সৃষ্টি হয়—তাকেই ব্রহ্ম বলে। ভগবান যেহেতু পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উৎস, তাই তিনি হচ্ছেন সমগ্র জীবকুল ও অস্তিত্বশীল সব কিছুরই উৎস। যিনি এটি জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই রকম শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ভগবানের একজন ভক্ত সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হন এবং যখনই এই প্রকার ভক্ত স্বজাতীয় স্নিগ্ধ ভক্তদের সমাবেশে মিলিত হন, তখন তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার গুণকীর্তন ছাড়া আর কিছু করেন না। যারা শুদ্ধ ভক্ত নয় এবং যারা কেবলমাত্র ভগবানের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা উপলব্ধি করেছে, তারা শুদ্ধ ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবান শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করে সর্বদাই তাঁদের সাহায্য করেন; এভাবেই তাঁর বিশেষ অনুকম্পাবশত সমস্ত অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা এবং যোগীরা এটি চিন্তা করতে পারে না, কারণ তারা কম-বেশি নিজেদের শক্তির ওপরই নির্ভরশীল। *কঠোপনিষদে* বলা হয়েছে, যাঁদেরকে তিনি অনুগ্রহ করেন, একমাত্র তাঁরাই ভগবানকে জানতে পারেন, অন্য কেউ নয়। এই প্রকার অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের ওপর অর্পিত হয়। *শ্রীঈশোপনিষদ* ভগবানের অনুগ্রহ এভাবেই উল্লেখ করেছে, যা ব্রহ্মজ্যোতির সীমানার ঊর্ধ্বে।

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

বায়ুঃ—প্রাণবায়ু; **অনিলম্**—অখিল বায়ুর উৎস; **অমৃতম্**—অবিনশ্বর; **অথ**—এখন; **ইদম্**—এই; **ভস্মান্তম্**—ভস্মে পরিণত হওয়ার পর; **শরীরম্**—শরীর; **ওঁ**—হে ভগবান; **ক্রতো**—সকল যজ্ঞের ভোক্তা; **স্মর**—কৃপা করে স্মরণ রাখবেন; **কৃতম্**—আমার দ্বারা যা কিছু করা হয়েছে; **স্মর**—কৃপা করে স্মরণ রাখবেন; **ক্রতো**—পরম হিতৈষী; **স্মর**—দয়া করে স্মরণ করবেন; **কৃতম্**—আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি; **স্মর**—অনুগ্রহ করে স্মরণ করবেন।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন, হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

এই অনিত্য জড় শরীর নিঃসন্দেহে এক বিজাতীয় পোষাক। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩, ১৮, ৩০) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড় দেহের বিনাশের পর, জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সে তার পরিচয় হারায় না। জীবের পরিচয় কখনই নিরাকার বা আকৃতিহীন নয়। পক্ষান্তরে, তার জড় পোশাকটি আকারহীন, এবং সেটি অবিনশ্বর ব্যক্তিটির রূপ

অনুযায়ী একটি আকার গ্রহণ করে। মূলত কোন জীবই আকৃতিহীন নয়, যদিও অনেক স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ভুলবশত তা মনে করে। এই মন্ত্রে এই সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জড় দেহের বিনাশ হওয়ার পরও জীবের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

জড় জগতে জড়া প্রকৃতির এক অপূর্ব কারিগরী শিল্পকলার প্রদর্শন হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন জীবদেহ সৃষ্টি করা। যে জীব বিষ্ঠা আহারে আগ্রহী তাকে বিষ্ঠা আহারের উপযোগী একটি জড় দেহ অর্থাৎ শূকরদেহ প্রদান করা হয়। সেই রকম, যে মাংস আহারে অভিলাষী তাকে একটি বাঘের দেহ প্রদান করা হয় যাতে অন্যান্য পশুদের রক্ত উপভোগ করে এবং তাদের মাংস আহার করে সে জীবন ধারণ করতে পারে। মানুষের দাঁতের আকৃতি যেহেতু ভিন্ন ধরনের, তাই বিষ্ঠা বা মাংস আহার তার জন্য নয়, এমন কি সবচেয়ে অনুন্নত আদিম অবস্থায়ও বিষ্ঠা আস্বাদনে তার কোন বাসনা থাকে না। মানুষের দাঁত এমনভাবে তৈরি যা দিয়ে সে ফল, শাক-সবজি চুষতে ও কাটতে পারে আর কুকুরের মতো দুটি দাঁতও দেওয়া হয়েছে যাতে সে মাংস খেতে পারে।

মানুষ ও পশুর জড় শরীরগুলি জীবাত্মার এক বিজাতীয় পরিচ্ছদ বিশেষ। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জীবের বাসনা অনুযায়ী সেই দেহগুলি পরিবর্তন করে। বিবর্তন চক্রে জীব একের পর এক দেহ পরিবর্তন করে। এই জগৎ যখন জলময় ছিল, জীব তখন একটি জলজ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর সে উদ্ভিদজীবন থেকে কীটজীবন, কীটজীবন থেকে পাখিজীবন, পাখিজীবন থেকে পশুজীবন এবং পশুজীবন থেকে মনুষ্যরূপ অতিক্রম করে। সবচেয়ে উন্নত দেহ হচ্ছে মনুষ্যদেহ যখন সেটি পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণ অনুভূতির অধিকারী হয়। পারমার্থিক অনুভূতির সর্বোত্তম বিকাশের বর্ণনা করা হয়েছে এই মন্ত্রে—যে জড় দেহটি ভস্মীভূত হবে তা ত্যাগ করা উচিত এবং বায়ুর সনাতন উৎসের

সঙ্গে প্রাণবায়ুর মিলন ঘটাতে হবে। বিভিন্ন রকম বায়ুর গতিবিধির দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে জীবের কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়, যাকে সংক্ষেপে প্রাণবায়ু বলে। যোগীরা সাধারণত দেহের বায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুশীলন করে। সর্বোচ্চ চক্র ব্রহ্মরন্ধ্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছায়, ততক্ষণ আত্মা এক বায়ুচক্র থেকে উপরের বায়ুচক্রতে উন্নীত হতে থাকে। সেই সর্বোচ্চ চক্রে উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠাবান যোগী যে কোন বাঞ্ছিত গ্রহলোকে নিজেকে স্থানান্তরিত করতে পারে। পন্থাটি হচ্ছে একটি জড় শরীর ত্যাগ করা এবং তারপর অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করা, কিন্তু জীব যখন জড় দেহ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে সক্ষম হবে, তখনই কেবল এই দেহ পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ সম্ভব, যা এই মন্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। সে তখন এক চিন্ময় পরিবেশে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের দেহ বিকাশ সাধন করতে পারে—একটি চিন্ময় দেহ যা কখনই মৃত্যু বা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় না।

এই জড় জগতে জড়া প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার ফলে তার দেহ পরিবর্তন করতে তাকে বাধ্য করে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা ও দেবতা পর্যন্ত বিবিধ প্রজাতির মধ্যে এই অভিলাষ প্রকাশিত হয়। এই সব জীবদের দেহ আছে যা বিভিন্ন আকারে জড় উপাদানে তৈরি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দেহের মধ্যে একত্ব দর্শন করেন না, তবে চিন্ময় স্বরূপে একত্ব দর্শন করেন। শূকর দেহই হোক বা দেবতার দেহই হোক, পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ চিন্ময় স্ফুলিঙ্গগুলি একই। জীব তার পাপ-পুণ্যের কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। মানবদেহ অতি উন্নত এবং তার মধ্যে পূর্ণ চেতনা রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী বহু জন্ম জ্ঞান অনুশীলনের পর অত্যন্ত বিশুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি ভগবৎ-চরণে শরণাগত হন। জ্ঞান অনুশীলনের সাফল্য লাভ তখনই সম্ভব যখন জ্ঞানী পরমেশ্বর

ভগবান বাসুদেবের শ্রীচরণে শরণাগত হন। তা ছাড়া এমন কি চিন্ময় স্বরূপের জ্ঞান লাভের পরেও জীবের এই মায়িক সংসারে পুনরায় পতন হয়, যদি সে এই পরম জ্ঞান লাভ না করে যে, জীবেরা হচ্ছে পূর্ণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কখনই পূর্ণতত্ত্ব হতে পারে না। বাস্তবিকই, ব্রহ্মজ্যোতিতে একত্ব লাভ হলেও জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

ভগবানের অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত ব্রহ্মজ্যোতি অসংখ্য চিৎ-কণা সমন্বিত এবংসেগুলি স্বতন্ত্র চেতন সত্তাবিশিষ্ট। কখনও কখনও এই সব জীব ইন্দ্রিয়ের ভোক্তা হতে চায় এবং তাই ইন্দ্রিয়ের তাড়নার মিথ্যা প্রভু হওয়ার জন্য তাদের এই জড় জগতে স্থান দেওয়া হয়। কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে জীবের ভবরোগ, কেন না ইন্দ্রিয়-ভোগের তাড়না থেকেই এই জড় জগতে প্রকাশিত বিভিন্ন দেহের মাধ্যমে সে দেহান্তরিত হয়। ব্রহ্মজ্যোতিতে একত্ব লাভ পরিণত জ্ঞানের লক্ষণ নয়। একমাত্র ভগবৎ-চরণে সম্পূর্ণ শরণাগতি এবং পারমার্থিক সেবাবুদ্ধির বিকাশ সাধনের দ্বারাই সর্বোচ্চ সাফল্যের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

এই মন্ত্রে জীব তাঁর জড় দেহ ও প্রাণবায়ু ত্যাগ করার পর চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশের জন্য প্রার্থনা করছেন। ভক্ত তাঁর জড় দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগে তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর দ্বারা কৃত উৎসর্গগুলি স্মরণ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। মৃত্যুর সময়ে বিগত-কর্ম ও অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই এই প্রার্থনা করা হয়। যে ব্যক্তি জড় মায়া দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, সে অতীত জীবনে তার জড় দেহের দ্বারা অনুচিত জঘন্য কার্যাবলীই স্মরণ করে, তার ফলে মৃত্যুর পর সে আর একটি জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেভাবেই ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করেন।" (*ভঃ গীঃ* ৮/৬)। এভাবেই মন মুমূর্ষু প্রাণীর প্রবৃত্তি পরবর্তী জীবনে বহন করে।

নির্বোধ পশুদের মন উন্নত নয় বলে সে তার জীবনের ঘটনা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু মানুষের মন উন্নত বলেই রাতে স্বপ্ন দেখার মতো চলমান জীবনের কার্যাবলী সবই সে স্মরণ করতে পারে; অতএব তার মন সব সময়ই জড়-জাগতিক বাসনায় আচ্ছন্ন থাকে এবং তার ফলে সে চিন্ময় দেহ নিয়ে চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তরা ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতির বিকাশ সাধন করেন। এমন কি মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি তাঁর ভগবৎ-সেবা স্মরণ করতে নাও পারে, তবু ভগবান তাঁকে বিস্মৃত হন না। ভক্তের ত্যাগ ও নৈসর্গের কথা ভগবানকে স্মরণ করানোর জন্য এই প্রার্থনাটি প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এমন কি স্মরণ করানোর কেউ না থাকলেও ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তের সেবার কথা কখনই বিস্মৃত হন না।

ভগবদ্গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে ভক্তের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন—"কেউ জঘন্যতম কর্ম করলেও যদি সে ভগবদ্ভজনে ব্রতী হয়, তা হলে সে সাধু বলেই বিবেচিত হবে, কারণ সে যথার্থ মার্গে অবস্থিত। সে তখন শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না। হে পার্থ, যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র আদি নীচ কুলে জাত হলেও পরম গতি লাভ করে। তাই এই দুঃখময় অনিত্য সংসারে আমার প্রতি প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত ব্রাহ্মণ, ধর্মাত্মা, ভক্ত ও রাজর্ষিরা কত মহিমান্বিত। সর্বদাই আমার চিন্তায় তোমার মনকে নিয়োজিত

কর, প্রণতি নিবেদন কর, এবং আমার উপাসনা কর। সম্পূর্ণভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।" (ভঃ *গীঃ* ৯/৩০-৩৪)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—"ভক্তের মধ্যে চারিত্রিক শৈথিল্য লক্ষিত হলেও, তাঁর সাধু জীবন যাপন করার জন্য তাঁকে ভক্ত বলেই গ্রহণ করা উচিত। 'অসচ্চরিত্র' শব্দের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। বদ্ধ জীবের দুটি কাজ—দেহের প্রতিপালন এবং আত্ম-উপলব্ধি। সামাজিক মর্যাদা, মানসিক উন্নতি, শৌচ, তপস্যা, পুষ্টি ও জীবন সংগ্রাম—সবই দেহ প্রতিপালনের জন্য। ভগবানের একজন ভক্ত হিসাবে কারও বৃত্তি অনুযায়ী কারও কার্যকলাপের অঙ্গ আত্ম-উপলব্ধির কাজ করা যায় এবং ভগবৎ সম্পর্কেও এভাবেই কাজ করা যায়। এই দুটি কার্য একই সাথে করা উচিত, কারণ একজন বদ্ধ জীব তার দেহের প্রতিপালন পরিত্যাগ করতে পারে না। ভগবদ্ভজন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের প্রতিপালনের কর্ম সমানুপাতিক ভাবে হ্রাস পায়। ভগবদ্ভজন নির্দিষ্ট পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বিষয়াসক্তি পরিলক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত যে, সেই বৈষয়িক কার্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কারণ ভগবৎ-কৃপায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই অসম্পূর্ণতার অবসান হয়। তাই ভগবদ্ভজনের পথই একমাত্র সঠিক পন্থা। কেউ যদি সঠিক পন্থা অবলম্বন করেন, এমন কি সাময়িক বৈষয়িক কার্যকলাপের ঘটনা তাঁর আত্ম-উপলব্ধির উন্নতি সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।"

ভগবৎ-উপাসনার সুযোগ-সুবিধাকে নির্বিশেষবাদীরা অস্বীকার করে, কারণ তারা ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতির রূপে আসক্ত। পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির নির্দেশ অনুযায়ী তারা ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের সবিশেষ রূপে বিশ্বাসী নয়। কারণ তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে

কুতর্ক ও মননশীলতার পথই অনুসরণ করেন। তাই নির্বিশেষবাদীদের সব প্রয়াসই নিষ্ফল, যা *ভগবদ্গীতার* দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২/৫) প্রতিপন্ন হয়েছে।

পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের এই মন্ত্রে উল্লিখিত সব সুযোগই সহজলভ্য হয়। ভক্ত যে নয় প্রকার দিব্য কর্মানুষ্ঠান করে ভগবদ্ভজন করেন তা হচ্ছে — ১) ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ, ২) ভগবানের গুণকীর্তন, ৩) ভগবানকে স্মরণ, ৪) ভগবানের পাদপদ্মের সেবন, ৫) ভগবানের প্রতি অর্চন, ৬) ভগবানের প্রতি বন্দনা, ৭) ভগবানের প্রতি দাস্য, ৮) ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য উপভোগ এবং ৯) ভগবানের প্রতি সবকিছু আত্মসমর্পণ। ভগবদ্ভক্তির এই নয়টি প্রণালীর সব কয়টি বা যে কোন একটিই নিত্য ভগবৎ-সঙ্গ লাভে ভক্তকে সাহায্য করে। এভাবেই জীবনের শেষে ভগবানকে স্মরণ করতে ভক্তের পক্ষে সহজ হয়। ভগবদ্ভক্তির এই নয়টি বিধির সব কয়টি অথবা একটির পর একটি গ্রহণ করলে নিরন্তর ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে ভক্তকে সাহায্য করে। এভাবেই জীবনের অন্তিমকালে ভগবানকে স্মরণ করা সহজ হয়। এই নয়টি বিধির একটি মাত্র গ্রহণ করে, পরবর্তী খ্যাতিমান ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল—১) শ্রবণ করেই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। ২) শুধু ভগবানের মহিমা কীর্তন করেই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রবক্তা শুকদেব গোস্বামী পরমার্থ লাভ করেছিলেন। ৩) বন্দনা করেই অক্রুর বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। ৪) স্মরণ করেই প্রহ্লাদ মহারাজ বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৫) অর্চনা করেই পৃথু মহারাজ সাফল্য লাভ করেছিলেন। ৬) ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করেই লক্ষ্মীদেবী সাফল্য লাভ করেছিলেন। ৭) ভগবানের দাসত্ব করেই হনুমান বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। ৮) ভগবানের সঙ্গে সখ্যতার মাধ্যমে অর্জুন বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন।

৯) সব কিছু আত্মনিবেদন করেই বলি মহারাজ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্র এবং কার্যত বৈদিক সব মন্ত্রই সংক্ষেপে *বেদান্তসূত্রে* উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানবৃক্ষের সুপক্ক ফল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্নোত্তরের সময় *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই বিশেষ মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের শ্রবণ ও কীর্তনই হচ্ছে ভক্তিজীবনের মূলনীতি। মহারাজ পরীক্ষিৎ সম্পূর্ণ *ভাগবত* শ্রবণ করেন এবং শুকদেব গোস্বামী তার কীর্তন করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে ভগবৎ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, কারণ সেই সময় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ আচার্য।

মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ্য প্রশ্ন ছিল—"প্রতিটি মানুষের কর্তব্য কি, বিশেষত মৃত্যুর সময়ে?" শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

"সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী প্রত্যেকেরই কর্তব্য পরম নিয়ন্তা, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা হরণকারী ও সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর হরির কথা নিত্য শ্রবণ করা, কীর্তন করা ও স্মরণ করা।" (ভাঃ ২/১/৫)

তথাকথিত মানবসমাজ সাধারণত রাতে নিদ্রা ও যৌন সহবাস আর দিনে যতদূর সম্ভব অর্থোপার্জনে অথবা পরিবার প্রতিপালনের জন্য দোকানে কেনাকাটায় নিয়োজিত থাকে। ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা করা অথবা তাঁর সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করার সময় মানুষের নেই বললে চলে। কতভাবেই না তারা ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, প্রাথমিকভাবে তাঁকে নিরাকার-নির্বিশেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতিহীন

ঘোষণা করে। যাই হোক, *উপনিষদ, বেদান্তসূত্র, ভগবদ্গীতা* বা *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভগবান সচেতন অস্তিত্বশীল পুরুষ এবং অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁর মহিমান্বিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর থেকে অভিন্ন। সুতরাং সমাজের তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের নিরর্থক কাজের কথা বলা ও শোনায় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, বরং তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যে, ক্ষণমাত্র সময় অপচয় না করে ভগবৎ কার্যকলাপে সে নিয়োজিত হতে পারে। *শ্রীঈশোপনিষদ* আমাদের সেই রকম ভগবৎ-সেবার নির্দেশই দিচ্ছেন।

ভগবৎ অনুশীলনে অনুরক্ত না হলে মৃত্যুর সময় যখন দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন মানুষ কী স্মরণ করবে, এবং তখন তার উৎসর্গের কথা স্মরণ করার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে কিভাবে সে প্রার্থনা করবে? উৎসর্গের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের স্বার্থ অস্বীকার করা। জীবিতকালে ভগবানের সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োগ করার কৌশল শিক্ষা করতে হয়। তা হলে মৃত্যুর সময় এই রকম শিক্ষার ফলকে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব।

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

অগ্নে—হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়—কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা—সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্—আমাদিগকে; বিশ্বানি—সমস্ত; দেব—হে দেব; বয়ুনানি—কার্যাবলী; বিদ্বান্—জ্ঞাতা; যুয়োধি—কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ—আমাদের থেকে; জুহুরাণম্—পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনঃ—সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম্—বার বার; তে—আপনাকে; নমঃ উক্তিম্—প্রণাম উক্তি; বিধেম—আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন, যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করে, ভক্ত পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। ভগবানকে

এখানে অগ্নি বলে সম্ভাষণ করা হয়েছে, কারণ শরণাগত ভক্তের পাপ সহ সব কিছুই তিনি ভস্মীভূত করতে পারেন। ইতিপূর্বে আলোচিত মন্ত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরম-তত্ত্বের যথার্থ বা অন্তিম রূপ হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবানরূপে তাঁর স্বরূপ। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপ হচ্ছে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল আবরণ। আত্ম-উপলব্ধির সকাম কর্ম বা কর্মকাণ্ডের পন্থা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার নিম্নতম স্তর। যে মাত্র এই প্রকার কার্যকলাপ *বেদের* বিধি-নিষেধ থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়, তখন সেগুলি বিকর্মে পরিণত হয় অথবা অনুষ্ঠানকারীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই মায়াবদ্ধ জীব সেই রকম বিকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং এভাবেই তা আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে ওঠে।

একমাত্র মানব-জীবনেই আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব; কিন্তু অন্য কোন জীবনে সম্ভব নয়। চুরাশি লক্ষ প্রজাতি বা আকৃতিসম্পন্ন জীব রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র মানব-জীবনেই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ আছে। ইন্দ্রিয়-সংযম, সহিষ্ণুতা, সরলতা, পূর্ণজ্ঞান ও ভগবানে পরিপূর্ণ বিশ্বাস—এগুলি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই নয় যে, উচ্চবংশে জন্মলাভের জন্য গর্বিত হতে হবে। যেমন বড় মানুষের সন্তান বড় মানুষ হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই রকম ব্রাহ্মণের সন্তানও ব্রাহ্মণত্ব লাভের সুযোগ লাভ করে। তবু জন্মাধিকারই সব কিছু নয়, কেন না নিজেকে অবশ্যই ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করতে হবে। যেমাত্র কেউ ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য গর্বিত হয় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের যোগ্যতা অর্জনে অবহেলা করে সে, তৎক্ষণাৎ অধঃপতিত হয় এবং আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে। এভাবেই সে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে পরাভূত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১/৪২) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যোগভ্রষ্ট বা আত্ম-উপলব্ধির সাধনপথ থেকে যাঁরা পতিত হয়েছেন, তাঁদেরকে সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে অথবা ধনীবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এই রকম জন্মগ্রহণ আত্ম-উপলব্ধির পথে অধিক সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু মায়াগ্রস্ত হয়ে যদি এই সুযোগের অপব্যবহার করা হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান প্রদত্ত মানব-জীবনের অপূর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

বৈধী ভক্তির পথ এমন যে, তা পালন করে তিনি সকাম কর্মের স্তর থেকে দিব্য জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হন। বহু বহু জন্মের পর দিব্য জ্ঞানের স্তর লাভের পর যখন কেউ ভগবানের প্রতি শরণাগত হন, তখনই তাঁর জীবন সফল হয়। এটিই হচ্ছে অগ্রগতির সহজ সাধারণ পদ্ধতি। কিন্তু এই মন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যে সর্ব প্রথমেই শরণাগত হয়, সে কেবলমাত্র ভক্তিমূলক মনোভাব গ্রহণের জন্য তৎক্ষণাৎ সব স্তর অতিক্রম করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বর্ণনা অনুযায়ী ভগবান তৎক্ষণাৎ এই প্রকার শরণাগত ভক্তের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার সকল পাপ কর্মের ফল থেকে তাকে মুক্তি প্রদান করেন। কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপে অনেক পাপের প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হয়, জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনের পথে এই প্রকার পাপময় কার্যকলাপের পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পথে বাস্তবিকপক্ষে পাপের প্রতিক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। ভগবদ্ভক্ত শুধু ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্নই হন না, স্বয়ং পরমেশ্বরের সকল সদ্‌গুণাবলীই তিনি অর্জন করেন। এমন কি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হলেও, দক্ষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মতো সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতা আপনা থেকেই তিনি অর্জন করেন। এমনই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা, তিনি একজন ব্রাহ্মণ বংশজাত ব্যক্তিকে নীচ চণ্ডালে পরিণত করতে পারেন, আবার কেবল ভগবদ্ভক্তির বলে নীচ চণ্ডালকে যোগ্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেয় করতে পারেন।

সর্বশক্তিমান ভগবান যেহেতু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাই তিনি তাঁর নিষ্কপট ভক্তকে নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তিনি সঠিক পথ লাভ করে। ভক্ত অন্য কিছু কামনা করলেও, এই রকম নির্দেশ, বিশেষভাবে ভক্তকে প্রদান করেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কর্ম অনুষ্ঠানের বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও কর্মীর নিজ দায়িত্বে ভগবান সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে, ভগবান তাঁকে এমনভাবে নির্দেশ দেন, যে, তিনি কখনও ভুলভাবে কর্ম করেন না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

"ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, এমন কি ভক্ত কখনও কখনও বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ কর্ম বা বিকর্মের ফাঁদে পতিত হলেও, ভক্তের হৃদয়ের অভ্যন্তর ভগবান তৎক্ষণাৎ সংশোধন করেন। কারণ ভক্তমাত্রই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।" (*ভাঃ* ১১/৫/৪২)

এই মন্ত্রে ভক্ত ভগবানকে প্রার্থনা করছেন যাতে তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তাঁকে শোধন করেন। মানুষ মাত্রই ভুল করে। বদ্ধজীব মাত্রই প্রায়শ ভুল করে এবং এই প্রকার অজ্ঞাত পাপের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে ভগবৎ-চরণে আত্মনিবেদন করা যাতে তিনি পথ-নির্দেশ প্রদান করেন। সম্পূর্ণ শরণাগত আত্মার দায়িত্ব ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন; এভাবেই শুধু ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন ও তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সকল সমস্যারই সমাধান হয়। নিষ্কপট ভক্তকে দুভাবে এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমটি হচ্ছে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের মাধ্যমে এবং অন্যটি হচ্ছে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত স্বয়ং ভগবানের মাধ্যমে। এভাবেই ভক্ত সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হন।

বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে অপ্রাকৃত এবং জড় শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একমাত্র ভগবান ও পারমার্থিক গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমেই বৈদিক মন্ত্র উপলব্ধি করা যায়। কেউ যদি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন। ভগবান ভক্তের কাছে গুরুদেবরূপে আবির্ভূত হন। এভাবেই গুরুদেব, বৈদিক নির্দেশাবলী এবং অন্তর্যামী ভগবান স্বয়ং পূর্ণশক্তির দ্বারা ভক্তকে পরিচালিত করেন। তাই ভক্তের জড়-জাগতিক মায়ামোহে পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই ভক্তজীবন সর্বতোভাবে সুরক্ষিত এবং ভক্ত নিশ্চিতভাবে সাফল্যের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছান। সমগ্র পদ্ধতিটি এই মন্ত্রের মাধ্যমে আভাস দেওয়া হয়েছে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭-২০) আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন উভয়ই পুণ্যকর্ম। ভগবান চান সকলেই তাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্তন করুক কারণ তিনি সমগ্র জীবের সুহৃদ। ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা যে-কেউ সমস্ত অবাঞ্ছিত বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ হন এবং ভগবানের প্রতি তার ভক্তিনিষ্ঠা দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। এই স্তরে ভক্ত ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেন এবং ইতর রজ ও তমোগুণ জাত প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। তাঁর ভগবদ্ভক্তির বলে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন এবং এভাবেই তিনি ভগবানকে লাভ করার উপায় অবগত হন। সব সংশয় বিদূরিত হওয়ায় তিনি এক শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন।

এভাবেই যে শাস্ত্রজ্ঞান মানুষকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, সেই শ্রীঈশোপনিষদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে ভারতের অন্তহীন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে নিয়ে আসার জন্য বহু মনীষী বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রীল প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

"শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।"

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"পাশ্চাত্যের অত্যন্ত সক্রিয় ও স্থূল জড়বাদ-প্রসূত, সমস্যা-জর্জরিত, ধ্বংসোন্মুখ, পারমার্থিক চেতনাবিহীন ও অন্তঃসারশূন্য সমাজের কাছে স্বামী ভক্তিবেদান্ত এক মহান বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। সেই গভীরতা ব্যতীত আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদগুলি কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

টমাস মেরটন
ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্

"ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধস্তন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সব চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি ও দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সংগঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি বড় বড় শহরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য।"

প্রফেসর মহেশ মেহতা
প্রফেসর অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
ইউনিভার্সিটি অভ্ উইণ্ডসর,
অন্টারিও, কানাডা

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"

জোসেফ জিন লানজো ডেলভাস্টো
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক

"শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষেরা অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত মানব-সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক। ভারতবর্ষের বাইরের জগৎ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের ভারতের কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেছেন।"

শ্রীবিশ্বনাথ শুক্লা, পি-এইচ. ডি
প্রফেসর অভ্ হিন্দি,
এম, ইউ, আলিগড়,
উত্তরপ্রদেশ

"পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে, যেমন যে কোন সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রিস্টান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনই তার জন্ম থেকেই ধ্যান ও যোগসাধনের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বহু অসৎ লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মন্ত্র দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের অন্ধ অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদেরই একটু জ্ঞান আছে, তাঁরাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' ও 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত

ধারণাপ্রসূত যে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।"

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অভ্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিস
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস
দি ইউনিভার্সিটি অভ্ মেক্সিকো

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।"

ডঃ সি. এল. স্প্রেডবারি
প্রফেসর অভ্ সোসিওলজি,
স্টিফেন এফ অস্টিন স্টেট ইউনিভার্সিটি

"ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন ও পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার জন্য। মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের এক মহান পথপ্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশটিরও অধিক পারমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কয়টি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ *ভাগবতের* বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে, সেই জন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডঃ আর কালিয়া
প্রেসিডেন্ট
ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন্

"বৈদিক শাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই তত্ত্বদর্শনের বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাণী বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। বাস্তবিকই এটি এক মহান অনুপ্রেরণা-প্রসূত রচনা, যা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে 'কেন', 'কবে' ও 'কোথায়' প্রভৃতির অনুসন্ধানের সন্ধান দেবে।"

ডঃ জুডিথ এম টাইবার্গ
ফাউণ্ডার এণ্ড ডিরেক্টর
ইস্ট-ওয়েস্ট কালচারাল সেন্টার
লস্ এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

"...শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারী রূপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররূপে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই 'কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি' (His Divine Grace) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বামী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তাঁর *ভগবদ্গীতা-ভাষ্য* মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছে, কারণ তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক স্বীকৃত *ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের* প্রামাণিক বিশ্লেষণ। খ্রিস্টান দার্শনিক ও ভারত-তত্ত্ববিদ্ রূপে আমার এই প্রশস্তি ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।"

অলিভিয়ার ল্যাকোম্ব
প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি দ্যা প্যারিস, সর্বোন
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অভ্ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, প্যারিস

"আমি গভীর উৎসাহ, মনোযোগ ও সাবধানতার সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর গ্রন্থগুলি পাঠ করেছি এবং দেখেছি যে, ভারতের পারমার্থিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎসাহী যে-কোন মানুষের কাছে সেগুলির মূল্য অবর্ণনীয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি অত্যন্ত জটিল ভাবধারাগুলি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তার

মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই সেই পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যা অতি অল্প কয়েকজন মহাপুরুষই লাভ করেছেন।"

ডঃ এইচ. বি. কুলকার্নী
প্রফেসর অভ্ ইংলিশ এ্যাণ্ড ফিলসফি
উটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান, উটা

"আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।"

ডঃ সুদা এল ভাট
প্রফেসর অভ্ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস
বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদগুলি ভারত-তত্ত্ববিদ্ ও ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ, উভয়ের কাছেই এক মহা আনন্দের বিষয়।

"...গভীর মনোযোগ সহকারে যে-ই তাঁর ভাষ্যগুলি পাঠ করবে, সে-ই বুঝতে পারবে যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, চিন্তা, আবেগ ও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়।"

"...অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আসক্ত মানুষের পাঠাগারগুলি অলংকৃত করবে—তা তিনি পণ্ডিতই হোন, ভক্তই হোন অথবা সাধারণ পাঠকই হোন।"

ডঃ জে. ব্রুস লঙ্গ
ডিপার্টমেন্ট অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
কর্ণেল ইউনিভার্সিটি